# ধূলিগন্ধা

মহাবিদ্যালয় সাহিত্য-পত্রিকা

মে, ২০২৩

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

বলাগড়, হুগলী

**Dhuligandha**

**College Magazine**

**Balagarh Bijoy Krishna Mahavidyalaya**

**Balagarh, Hooghly**

**May, 2023**

**সভাপতি –**

ড. প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ

**আহ্বায়ক ও সম্পাদক –**

অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ড. প্রসেনজিৎ বসু, ড. সুস্মিতা দাস

**সদস্য –**

অধ্যাপক হাসিনা খাতুন, অধ্যাপক সঙ্গীতা মণ্ডল, অধ্যাপক মলয় ঘোষ, অধ্যাপক অমৃতা চক্রবর্তী

**ছাত্র প্রতিনিধি –**

সুস্মিতা বারিক (বাংলা বিভাগ), অলিভিয়া চক্রবর্তী (ইংরেজী বিভাগ), স্নেহা ঘোষ (বিজ্ঞান বিভাগ), অভিজিৎ মাধু (ইতিহাস বিভাগ), অর্ঘ্য দাস (বাণিজ্য বিভাগ), বৃষ্টি দেবনাথ (সংস্কৃত বিভাগ), আকাশ সরকার (সাধারণ কলা বিভাগ)

**প্রচ্ছদ :** ঋজু মজুমদার (প্রাক্তন ছাত্র)

**প্রকাশক :** ড. প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

**মুদ্রণ :** মৃত্তিকা প্রকাশনী

**প্রকাশকাল :** মে, ২০২৩

## ‘ধূলিগন্ধা’র জন্মলগ্নে দেওয়া বিজয়কৃষ্ণ মোদকের শুভেচ্ছা-বাণী

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় হল হুগলী জেলার পিছিয়ে পড়া, দরিদ্রতম মানুষ অধ্যুষিত একটি অঞ্চলের আশার আলো, সেখানকার শ্রমজীবী মানুষদের বুকের মধ্যে লালন করা দীর্ঘদিনের একটি আকাঙ্ক্ষার মূর্তরূপ। সেই মহাবিদ্যালয়ের প্রথম সাহিত্য সংকলন প্রকাশের আনন্দময় মুহূর্তে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংকলন প্রকাশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ একে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞান - বিজ্ঞানের চর্চা একটি নতুনতর মাত্রা পায়। নানান দ্বিধা ও সংকোচ অনেক সময়ে শিক্ষার্থীর মানসলোকে এক অকারণ জড়তার সৃষ্টি করে থাকে। নতুন ঐ মাত্রায় ধীরে ধীরে উক্ত জড়তা অপসৃত হয়ে সচেতনতার দৃঢ়তা লাভ করে।

আর শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়ায় যদি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিজ পরিবেশ, নিজ সমাজ, নিজ ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা বিকশিত হওয়ার সুযোগ না থাকে, তবে তার সার্থকতা কোথায়? কারণ যে শিক্ষা শুধু শিক্ষিত করে তোলে, সচেতন করে না, তা মানুষকে পশ্চাদমুখ করে দেয়। কিন্তু সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ তো চেয়েছে সম্মুখে এগিয়ে যেতে।

সেই এগিয়ে চলার সাথী হোক ‘ধূলিগন্ধা’, বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য সংকলন।

তাং- ৪ মে, ১৯৯৩

বিজয় মোদক

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সভাপতি

পরিচালন সমিতি

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

বিপ্লবী বিজয়কৃষ্ণ মোদক

প্রতিষ্ঠাতা, বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

আবির্ভাব : ২৭ জুন, ১৯০৬

তিরোধান : ৯ মে, ১৯৯৪

**"দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু"**

২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে আমরা হারিয়েছি বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য মাননীয় তরুণ সেন মহাশয়কে। তাঁর সুচিন্তিত মতামতে ও পরামর্শে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। তাঁর অকালপ্রয়াণে আমরা মর্মাহত, শোকস্তব্ধ। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তিকামনা করি। তাঁর পরিবারের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক সমবেদনা।

## অধ্যক্ষের কলমে

''ধূলিগন্ধা"। আমাদের বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের অন্যতম ধারক। এই পত্রিকার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীদের উদ্যম, আবেগ আর আলোর বিশুদ্ধ-সাধনা। নিয়মানুদৈনিকের গ্লানির থেকে জন্ম নেয় ধূসরের পাণ্ডলিপি। আর সেই পাণ্ডলিপিতে লেখা থাকে বুক-পুকুরের কান্না। আশার আলো আর নৈরাশ্যের "কান্না-অক্ষরে"-র থেকে জন্ম নেয় শিল্প। জন্ম নেয় সাহিত্য। আর সেই সময়েই সমস্ত ব্যথা ধন্য করে ফুটে ওঠে শিল্প ফুল-বনে হৃদয় রক্তক্ষরণের রাঙা পলাশ। জীবন সমুদ্রের ব্যাপ্তি থেকেই সাহিত্য সমুদ্রের পথ-রেখা তৈরি হয়। নতুন বোধি বিন্দুর বোধ থেকে যে শিল্পের জন্ম হয় তার দুঃখগুলির মাঝেও পাঠক যখন নিজের অনুভবকে আবিষ্কার করেন তখনই দুঃখ-জলের তরঙ্গে বাজে চির আনন্দের রাগ দরবারি। এই আনন্দকেই এ্যারিস্টটল বললেন ক্যাথারসিস। মহত্ত্ব আর বিনয় আমাদের আলোক সন্ধানের দিকে নিয়ে যায় নিরন্তর।

শিল্প কি শুধুই ইস্তেহার! প্রশ্নটা চিরকালীন। মনে হয় প্রতিটি শিল্পের শরীর জুড়ে লেগে থাকে স্বর্ণ চাঁপার মতন রৌদ্র দুপুর বেলায় বিকশিত হয়ে ওঠার আনন্দ। হয় তো দাবদাহ চলছে বুকের গভীরে, যেমন চলতে থাকে প্রকট গ্রীষ্মের সময়ে। কিন্তু যেই বুক জ্বালানো অভিজ্ঞতার রোদ্দুর-ঘেরা চিন্তা শিল্পের পথ ধরে হাঁটতে থাকে, তার মধ্যেই থাকে অমৃত কুম্ভের সন্ধান। বুকের কৃষ্ণগহ্বর থেকে একজন শিল্পী নিয়ে আসতে পারেন মুক্তো-ধারক ঝিনুকের সম্ভার। আমাদের মহাবিদ্যালয়ের পূর্ব ঐতিহ্য মতোই আমার এক আকাশ বিশ্বাস আছে আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রতি। তাঁদের আজকের প্রকাশিত লেখাটি আগামীদিনের শিল্প চর্চার আলোক দিশারী হবে। হয়ে উঠবে। শিল্প তো অকাল-আনন্দময় সাত ঘোড়ার মতন গতিশীল। শিল্পীরাই তো আমাদের সমাজ আন্দোলনের পথিকৃত চক্রব্যূহভেদী। আমার বুকের গভীরে যে আনন্দের পুরুষ বসে আছেন তাঁর দেখানো বোধের থেকে বিশ্বাস করি আমাদের মহাবিদ্যালয়ের এই পত্রিকা অনেক ভিড়ের ভেতরেও স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

শুভেচ্ছা সহ -

ড. প্রতাপ ব্যানার্জী,

অধ্যক্ষ

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

## সভাপতির শুভেচ্ছা-পত্র

সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতে ওঠাই যৌবনের ধর্ম। সাহিত্যচর্চা তথা বহুবিধ সৃজনশীলতার প্রকাশ সেই উৎস মুখকেই আলোড়িত করে। বর্তমানে সাহিত্য পাঠের অভ্যাস ক্রমশ হ্রাসমান। তবুও এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী-ছাত্ররা যে মহতী উদ্যোগে সামিল হয়েছে, তাদের মৌলিকত্ব, ভাবনার গভীরতা এই মহাবিদ্যালয়ের "ধূলিগন্ধা" পত্রিকাটিতে প্রকাশ পাবে এই কামনা করি। আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি, আঞ্চলিক ঐতিহ্য, সুদীর্ঘ-লালিত সম্প্রীতির কোলাজ হয়ে উঠুক আমাদের প্রাণের পত্রিকা "ধূলিগন্ধা"।

শুভেচ্ছা-সহ

মহীরুল হক

সভাপতি, পরিচালন সমিতি

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

## সূ চী প ত্র

**সম্পাদকীয় ১১**

**প্রবন্ধ**

A Holistic Concept of Corporate social Responsibility - Dr. Pratap Bandapadhyay ১২

HIGHER EDUCATION IN POST INDEPENDENCE INDIA: THE UNASKED QUESTION - Dilip Kumar Chatterjee ১৮

নাম তার নূর এনায়েত খান (এক রাজকন্যার গুপ্তচর হয়ে ওঠার কাহিনী) - ডালিয়া হোসেন ২১

Literature in the age of Al : A Debate in Hell - Dr. Abhijit Ghosh ৩১

Revolutionary Bijoy Krishna Modak - Partha Chattopadhyay ৩৪

"সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি" - রাহুল ঘোষ ৪০

আসন : একটি প্রাথমিক ধারণা - মীনা ঘোষ ৪২

অ্যারিস্টটল:  আজও সমান প্রাসঙ্গিক - সায়ন্তিকা দাস ৪৫

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্ কৌটিল্য - অন্তরা পাল ৪৯

Mahajani System: An Archive of Ancient Indian Accounting - Arghya Das & Arijit Das ৫১

নেশা - সুমন্ত দাস ৫৩

**গল্প**

সরস্বতীর অস্থি-চর্ম - ড. প্রসেনজিৎ বসু ৫৪

The Spiritual Call - Aliviya Chakraborty ৫৬

**কবিতা**

কবিতা-সপ্তক - কালাচাঁদ সাঁই ৫৮

স্বপ্নহারাদের স্পীডব্রেকার - দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য ৬০

তুমি যে শুধুই আমার – খেয়ালী দেবনাথ ৬১

A Maiden's Wish - Amrita Chakraborty ৬২

পরাধীনতার শৃঙ্খল – সঞ্চিতা ঘোষ ৬৩

মায়ের ভালোবাসা - স্বাতী বাউল দাস ৬৩

নদী - সঞ্চিতা বিশ্বাস ৬৪

মা - অঙ্কিতা সরকার ৬৫

সে কিছু দিতে এসেছিল বুঝি, নাকি নিতে - আকাশ সরকার ৬৬

শ্রাবণের বর্ষা - সুমনা ঘোষ ৬৭

# সম্পাদকীয়

"হৃদয় আমার প্রকাশ হলো অনন্ত আকাশে।

বেদন বাঁশি উঠলো বেজে বাতাসে বাতাসে"।।

হৃদয়ের কথা প্রকাশ করার তাগিদ মানুষের চিরন্তন। জীবন যেভাবে আমাদের স্পর্শ করছে, আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, সেই অভিজ্ঞতা, সেই অনুভূতি আমরা চাই সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে। আমরা চাই, আমাদের চলে যাওয়ার পরেও যেন আমাদের ভাবনাগুলি রয়ে যায়। রয়ে যায় লেখার অক্ষরে, রয়ে যায় ছবির রঙে, রয়ে যায় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের খাঁজে, রয়ে যায় নৃত্যের বিভঙ্গে, গানের সুরে। আত্মপ্রকাশের এই বাসনা — যাকে কবি বলেছেন, "এই যে আলোর আকুলতা"— এই আকুলতা থেকেই যাবতীয় শিল্পের উদ্ভব।

একটি মহাবিদ্যালয়ের দায় থাকে তার ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং শিক্ষা কর্মীদের এই শিল্পীসত্তাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার। বিশেষত ছাত্র-ছাত্রীরা — যাদের চোখে এখন "সকলই শোভন, সকলই নবীন, সকলই বিমল"— তারা যেন সৃষ্টির নবীন মন্ত্র উচ্চারণের উপযুক্ত পরিসর পায়। এই প্রয়োজন থেকেই জন্ম নিয়েছিল 'ধূলিগন্ধা' — বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের শিল্প-সাহিত্য পত্রিকা। একে-একে অনেকগুলি সংখ্যা পার করেছে সে। প্রতিটি সংখ্যাই যেন সরস্বতীর মানস-সরসী। লেখাগুলি, ছবিগুলি একেকটি শ্বেতপদ্মের মতো ফুটে উঠেছে তাঁরই স্নেহময় ইঙ্গিতে। এই সংখ্যাটিও সেজেছে বর্ণময় বাণী আর বাণীময় বর্ণে। সাজিয়ে দিয়েছে/দিয়েছেন আমাদের প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং শিক্ষা কর্মীগণ। সম্পাদকগণ সেইসব কুসুম চয়ন করে মালা গেঁথেছেন মাত্র। এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

'ধূলিগন্ধা' এখন তোমাদের/আপনাদের। আমরা রইলাম অভিমতের অপেক্ষায়...

অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ড. প্রসেনজিৎ বসু, ড. সুস্মিতা দাস

সম্পাদক

'ধূলিগন্ধা'

## A Holistic Concept of Corporate social Responsibility

**Dr. Pratap Bandapadhyay**

"In this article, an attempt has been made to construct a system to pursue CRS in the right track. An attempt is made to knit our old value with modernity. This is the high time to put emphasis at charting out a roadmap for signifying the importance of CSR (corporate social responsibility) with the help of practical approach of Indian philosophy. This article keeps its attention only on commercial organizations in India keeping non-profit seeking organizations outside the boundary. This paper appeals to the entire business community in the world to run their multifarious operations embodying the spirit of universal humanity."

A very few Indian Corporates demonstrate an exemplary sense of social responsibility and it is consistent and example enough. But, if we search the whole picture of Indian corporate as a whole, we can say CSR is simply fake, they just do one percent and project it hundred times. Finally, in such a CSR philosophy most benefits and gains get steered towards the company itself and the society receives only a minuscule part of them. Moreover, they keep it on paper rather their actual works. Large sections of them are habituated to show less profit by manipulation of accounts or by maintaining duplicate books of accounts. They are master bluster in adulteration and other malpractices. Tax evasion is widely spreaded in our society. Some industries are not environment-friendly and produce hazard goods, poisoning our ground water and even destroying the very air, we breathe. In Bhopal, more than 8000 people died in the first three days after 40 tones of lethal gas spilled out from Union Carbide pesticide factory in December, 1984. Most of the brick-field at the bank of river Hooghly is responsible for environment pollution in WB. Corporate crimes are rampant and even extend to murders. We can cite the example of Haldiram Bhujawala case in Kolkata, a long ago, who had in engaged some hired gundas to dislocate a tea-stall and also to murder the vender, to expand hiring his business. Even private banks also make their practice to hire agencies to collect their bank loan and these agencies always use threats and other malpractices.

There are six cases involving Indian Administrative Service (IAS) officers among over 118 cases of corruption involving public servants that await prosecution sanction from the Central and State governments, according to the Department of Personnel and Training (DoPT) data. The number of government officials, public representatives and bank officials named in

these cases are over 300. In some cases, the sanction has been awaited since 2016.(THE HINDU October 19, 2023 07:48 pm | Updated 11:45 pm IST - NEW DELHI) India, sharing space with the Maldives, Kazakhstan, and Lesotho, secured 93rd position out of 180 countries in the Corruption Perception Index (CPI) for the year 2023, according to "Transparency International", a global civil society annual index. In 2022, India held the 85th position, sharing it with five other countries, including the Maldives. Despite a decline in rank, attributed to global movements, India's score dropped only by one point from the previous year, settling at 39 on a scale of zero (highly corrupt) to 100 (very clean).It is a common practice of the major companies to follow unethical business line for gaining high profit. In September2007, Prakash Sarvan, a customer of ICICI Bank, committed suicide after being publicly humiliated by bank's recovery agent. In the same time, a manager of HDFC Bank and two of its recovery agents were arrested for extortion and threatening a customer for recovery of loan. It has been also observed that medical practitioners in India in conjunction with pharmaceutical companies have been prescribing and there by promoting unnecessary drugs just for the sake of monetary gains. In India, dead persons are kept in Ventilation to augment medical bills. The developing world including India is becoming a favored destination for clinical trials and also for sex tourism. Corporate accountability scandals related to the appalling practices of corporate giants like Satyam Computer, DSQ Software Ltd., CRB Capital Markets and other have shocked the nation; these are few from long list. Satyam founder Ramalinga Raju, the most respected businessman (not today) resigned as its chairmanship after admitting to cooking up the account's books. His effort to fill the "fictitious assets with real one" through Mayatas acquisition was failed and he finally confessed his crime. Satyam lost a staggering Rs.10,000 crore (Rs.100billion) in market capitalization in a single day and the company' script was reduced by 78%, finally came down to Rs. 39.50 on BSE. If we remember two the security scams (Harshad Mehta in 1991 and Ketan Parekh in2001) and also UTI scam in 2000, we can say, such kind of scams are almost an annual event in our country till the year 2023. It is clearly evident that the occurrence and re-occurrence of such security scams and financial scandals at some point in time to attribute to a failure of corporate Governance in finance and that of financial regulation. In India, CSR is very much a part of the domain of big corporate action and that 'passive philanthropy' is not sufficient. At the micro level, CSR has not yet been conceived. It clears that small and medium sized businesses are not yet conscious about CSR. It can be expected that small traders can contribute something for local development but they often plays a significant role in

making temples or by making charities during festivals. They can think to change their track to be a true social person.

At present, the corporate lacks such true business leader with intellectual and moral integrity. In present day of globalization, life is becoming more and more complex and complexity hampers family and social life of individuals and also individual's life in the work-place. Absence of social control and culture lead to the crisis in life. A section of corporate manager is in practice to accumulate amassing wealth through bribery, fraud, forgery or cheating. These types of crime are not expected from those affluent members of society. Further, the elite and educated classes in any society are supposed to be backbone of moral conscience of the people. When the educated classes themselves succumb to the temptations of consumerism, materialism and the get-rich-quick-by-any-means syndrome, then this newly–adopted culture is bound to be reflected in their work-place.

In better India, a large section of people yearns for giant screen TV, a luxury car, a washing machine, smart phone/costly mobile, Central AC in house, a nice house and other such typo possessions that denote rising expectations and the 'Wealthy life'. As they can't get it in the right way within their salary, they do it through illegitimate way. Dissatisfaction lies in everywhere. Now, it is customary in our country that everything and everyone can be purchased with money. The constant drive for more growth and profit creates a harsh mentality. All plans and programs are directing to raise money and more money but not happiness, not well being and satisfaction. The cut-throat competition creates insecurity. In this new millennium, downsizing and restructuring, merger and take-over, deregulation and privatization nurture the greediest business practice. Many scholars from reputed-school see success in monetary terms and job which offers attractive pay-packet and it is the most tragic factor, they equate happiness with money. There is no transparency and openness in Indian business. Corruption in India has got its tentacles in all spheres and has eaten into our moral foundation.

The Indian philosophy emphasizes those actions, which are coming from the core of heart, will provide a sustainable results. The transition created by the market economy cannot provide us an exclusive painless solution so it can be advocated for Indian Philosophical ideals which in turn can provide self-disciplined incorporated life and which can also carry qualitative improvement both in work and personal life. We find that the most of management theories, models and concepts from west have

influenced in the domain of corporate management practices in India. But our swadesi (indigenous) theories and concepts are still relevant and can enrich us in the present age of globalization. We must look and re-look our own system which our ancestors keep for ourselves. We must learn the element of success from our ancient literatures and must cope with changes in people's management during the twenty-first century.

Corporate excellence in the context of Indian philosophy is an expression of virtue or 'Dharma'. In ancient India, Dharma was based on work. The nature of Dharmika was constant performance of action with efficiency. In the words of Prof. S. Radhakrishnan: "The Principles which we have to observe in our daily life and social relations are constituted by what is called dharma. It is truth's embodiment in life, and power to refashion our nature. For our purpose, we may define dharma as the whole duty of man in relation to the fourfold purposes of life (dharma, artha, kama and moksa) by members of four groups (Chaturvarna) and four stages (Chaturasrama). While the supreme aim of social order is to train human beings for a state of spiritual perfection and sanctity, it's essential aim is directed, by reason of its temporal ends towards such developments of social conditions as will lead the mass of people to a level of moral,material and intellectual life in accordance with the good and peace of all, as these conditions assist each person in the progressive realization of his life and liberty."(Religion and Society, (pp-104-107).

Listing the different systems of Indian philosophy as: Buddhism: Transcendence through suffering. Nyaya: Valid knowledge though logical criticism. Viselike: Analysis of the aspects of reality. Sankhya: A dualistic theory. Yoga: Disciplines for knowing the Self. Mimamsa: Freedom through the performance of duty. Vedanta: The philosophy of monism, Jainism: Non-violence and Self Control. Tigunait describes the most important common characteristics as: Direct experience. The acceptance of authority should be from the perspective of moral and ethical teachings, open-mindedness, flexibility and thoroughness.

Our India has many sources of ancient wisdom. The Vedas, the Upanishads, the Puranas and the Bhagavad Gita and the epics Mahabharata and Ramayana, all contain many nuggets of management principles and practice. This paper focuses only on objective-idealist system of Vedanta.

We find that there are three basic ideals in Upanishads-Satya, Dharma and Yana. These three ideals should be followed by modern managers to be more meaningful in their area of responsibilities. If we have to bring change in the selfish world, it can be done only by the serving others in the spirit of worship. It is only service based on these Upanishad ideals that can

bring massive change in our individual and collective lives. Cultivating faith in oneself is the best way to overcome emotional problems that many managers face. The Upanishad's vision of Ultimate Reality and all spiritual and moral values form the foundation of all the cultural forms and attitudes prevalent in India today.

In Upanishad, there is a set of rules for a student which is prescribed for his life after completion of formal education. Out of these, some are relevant for our future corporate managers in their active life of earning and contributing the society. For decades the wisdom of Swami Vivekananda has been inspiring millions of people worldwide with spiritual teaching free from designation and sectarianism. His message is engrossing and enriching and also relevant to today's problem, as they are profound yet practical. He prescribesd 'strength' to kill all worlds'evils. In the context of an occasion He came as a tonic to the depressed and demoralized Hindu mind and gave it self-reliance and some roots in the past".

Swami Vivekananda redefines 'Karma-Yoga' is the method of release through works, practice and activity. Karma compels all men to be active, to work industriously for the good of the society and, of course, for their own good. Vivekananda endeavors to lend great civic spirit to the Karma –yoga doctrine of work. Doing one's civic duty, working for common good, sacrificing one's personal interest is, in his word, not less than important than believing in God. This value can be applied in the modern business to do better business. A business can follow Karma-Yoga when we are engaged in selfless action without regard to the result or by more focusing on work. Similarly 'Bhakti-Yoga' (to remain in grace requires unalloyed devotion), the principles of devotion, commitment and loyalty to be followed to achieve corporate excellence. The corporate manager must be devoted to goal, should have commitment to process and loyalty to organization. The 'Janna-Yoga' (self-knowledge is the key to detachment), the path of knowledge, understanding and wisdom allow a manager to grasp a systematic view of the process of creating overall goodness for all stakeholders. The cultivation of these three elements show the way to form an individual attitude towards all aspects of life and finally it can be extended to an organizations' and society's benefit.

Gandhi introduces the doctrine of the trusteeship of the rich. The rich people should be made realize that the wealth in their possession should be utilized for the good of the poor. The rich people should also be made realize that the capital in their hands is the fruit of the labor of the poor man. This realization would make them see that the good of the society lies in using capital and riches for the good of others and not for one's personal

comforts. Then, the riches would function only as trustees for the poor. They would then keep all surplus wealth in trust and this would guarantee both economic solidity and economic equality.

This paper would be beneficial to these corporate managers, students, faculties who want to understand the core philosophy of CSR, defining CSR as business decision making and a strategy based on ethical value and extracts of cultural heritage; compliance with moral standard; and respect for communities, citizens and the environment. CSR is not mere a fashionable concept rather it is a management tool having holistic approach. The business must establish the relationships of truth and integrity with customers, stakeholders and society. As the corporate manager can be think as a bridge between the business and society, they need to be pure in heart and also should be patriot, these are two essentials of today's corporate manager to be best performer in implementing CSR policy. Enriched by strong ethics and walking forward with firms conviction to be good and do well.

# HIGHER EDUCATION IN POST INDEPENDENCE INDIA: THE UNASKED QUESTION

**Dilip Kumar Chatterjee**

**Associate Professor of Economics**

India's higher education sector has registered tremendous growth during last seventy five years after independence and side by side it has immensely contributed in the development process of the country. Though poorly vis-à-vis other comparable countries, the nation has so far earmarked large budgetary allocations to the cause of the sector but the return could neither fulfill the expectations of the policy makers, except enhanced enrolment ( exceeding four crore mark for the first time in 2020-21), nor could justify the spending on it. No repetition policy followed at the level of elementary education coupled with serious resource deficiency still persisting in this sector (9% of all the primary schools of the country numbering 1.17 lakh were running with single teacher in 2021-22) continue to present us with an alarming lag in the performance of the school children (results of the World Bank 2006 application of the TIMSS questions to secondary school students of Rajasthan and Orissa may be referred to). This lag gets accentuated at the higher education level where, in spite of similar resource crunch, open door policy has been embraced all through even going against the cautions vividly cited in the documents of the Kothari Commission. Out of 4.13 crore total higher education enrolment accomplished in 2020-21, around 72% goes to under graduate general courses (AISHE: 2020-21) imparting instructions on the curriculum having minimal direct connection with the job market. In course of time, an ocean of educated unemployment has been created incurring a huge cost from the public exchequer, personal resources as well as valuable time and energy of the youth. While it is officially reported that 8.6% of the population with secondary level or above remained unemployed in 2022 (PLFS-2022), according to a non-government research group, unemployment among the educated youth is thrice the national average. There are approximately 55 million people in the labour market with at least a graduate degree – of which nine million are estimated to be unemployed.

This apparent jeopardy in the higher education arena of the country will disappear once the purported link between higher education and job is denied. Be it denied or not by a decree, everyone experiences the negation

in reality. Then the question arises about the purpose of higher education in a country like India. One can easily observe that this question had never been taken into consideration at the policy making level. To proceed any further on this context, at least two secondary but most relevant questions come into the fore. In the first, the question of whether the purpose of higher education is not universally one and that in fact is not to reach the highest order of the knowledge world. This contention is squarely acceptable in case of pure education which is clearly distinct from applied education. This pure education vis-à-vis applied education distinction is to be viewed differently from the ongoing contrast between general education and professional education. Both general education and professional education can embody any of the pure or applied segments but not vice versa. We all know that courses in Medical Science or Management are included in the fold of professional education. Now, when a medical post graduate degree holder continues to formal studies for furthering her or his knowledge or efficiency that is applied education in nature in contrast to her or his engagement in research work towards enhancing the contour of knowledge which is closer to pure education. The same can be told for a post graduate in management looking at her or his study engagement approach. In India the higher education arena all along suffers from the confusion of whether it is pure or applied, the mere distinction between general education and professional education cannot clear that confusion. Consequently, the purpose of higher education here remains always blurred.

Secondly, the query of whether all countries had to face or are facing the same question regarding purpose of higher education may instantaneously come into the mind. If we look into the process of progress of modern education across countries since the first industrial revolution, a sharp north-south divide can be noticed. While in the European countries as well as in the US, society, polity, economy and education were intermingled in such a fashion that each one could garner a spontaneity within itself. Eventually the entire higher education arena there could develop a natural coexistence of ‘pure education’ and ‘applied education’ without dichotomization. But, in case of a country like India, infested with mass poverty, mass illiteracy, terrible inequality and social discrimination above all the traits of colonial legacy, modern higher education appeared as a system imposed from above. In such situations defining clearly the purpose of higher education and drawing carefully the demarcation line between ‘pure education’ and ‘applied education’ had been immensely important particularly for making fruitful policies. But, India ignored and still continues to ignore the need and we have been experiencing the

consequences of this unwarranted negligence for decades. The same is the fate of higher education in almost all the South-Asian countries. In this context it should have a mention that China could successfully plan to avoid such eventualities in its higher education sphere.

India also has a glorious history of five-year plans. Up to the third five-year plan no unemployment based crisis could develop in the higher education sphere of the country. The higher education enrolment ratio was around one at that time meaning only one out of a hundred of the eligible age group came forward for getting higher education. On the other side, large public investment and development expenditure could generate enhanced job opportunities. Consequently, almost all fresher graduates could be absorbed in no time. But, this education and employment bonhomie could not be sustained for long as higher education enrolment ratio shot up to nearly six during 1970's while employment opportunities started to recede progressively. In 2021-22 higher education enrolment reaches 28.4, out of which more than 70% are in the general education and job opportunity for a general stream fresh graduate has already reached its bottom level if not zero years back.

Policy makers' stated vision is to reach the country's higher education enrolment rate to 40 in near future. All should applaud this positive gesture. In a democratic country doors of the higher educational institutions should be opened for all. But before that the dichotomy between 'pure education' and 'applied' education is to be accorded due recognition. While scope for pure education shall be made limited, open door policy is to be followed in case of applied education where signals from the job market would be the prime regulator with special emphasis upon entrepreneurship development.

The dichotomy being a reality, a proper and detailed man power planning would be essential for preventing any further crisis in the higher education arena of the country. Obviously this would necessitate a thorough reorganization of the institutions, complete reorientation of the faculties and extensive additions of infrastructural facilities. To meet all these ends huge investment would be ipso facto. Private players would hardly be interested to this low profit or zero profit investments and in that case public exchequer would be the ultimate resort. Every year nearly 1.5 crore new youths attain adulthood in this country. Answers to the questions of what and where from they will learn, how and where from they will be able to earn their livelihood – would form the core of the man power planning and without a proper man power planning it is next to impossible to

redesign a meaningful and inclusive higher education system for the country.

---

## নাম তার নূর এনায়েত খান

## (এক রাজকন্যার গুপ্তচর হয়ে ওঠার কাহিনী)

**ডালিয়া হোসেন**

**সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ**

১৯১৪ সালের ইংরাজি নববর্ষের দিন, শীতের প্রকোপে জমাট বেঁধে গিয়েছিল মস্কোভা নদী, ক্রেমলিনের সবুজ বেগুনি গম্বুজগুলোর প্রতিক্ষিপ্ত আলোয় চক্ চক্ করছিল নদীর বরফের আস্তরণ। এমনই এক দিনে, ক্রেমলিনের অদূরেই ভুসোকা পেত্রোভস্কি মঠে একটি শিশুকন্যার জন্ম হয়। শিশুটির বাবা ছিলেন হজরত ইনায়েত খান, এক ভারতীয় সুফি যাজক এবং মা ওরা রে বেকার এক পরমা সুন্দরী মার্কিন মহিলা। বাবা-মা শিশুকন্যাটির নাম রেখেছিলেন নূরউন্নিসা অর্থাৎ 'নারীত্বের আলো'। শিশুটিকে 'পিরজাদি' বা পিরের কন্যা আখ্যা দেওয়া হয়। বাড়িতে সকলের নয়নমণি পিরজাদি নূরুন্নিসার আদরের ডাকনাম হয় বাবুলি। শুরু হয় নূর ইনায়েত খানের যাত্রা।

নূর এর পিতা ছিলেন একজন সুফি ধর্ম প্রচারক। শিক্ষক সৈয়দ আবু হাসেম তাঁকে পশ্চিমে সুফি ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন, গুরুর নির্দেশ মেনেই ভারত ছেড়েছিলেন ইনায়েত খান। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা মৌলা বক্শ এবং 'মহীশূরের বাঘ' টিপু সুলতানের নাতনি বক্শমেরির পৌত্র ছিলেন ইনায়েত খান। যদিও টিপু সুলতানের উত্তরপুরুষ হওয়ার গৌরব জনসমক্ষে প্রকাশ করত না ইনায়েত খানের পরিবার। সান ফ্রান্সিসকোর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ওরা রে বেকারের সঙ্গে আলাপ হয় ইনায়েত খানের। পরবর্তীকালে তারা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর স্ত্রীর নতুন নাম দেন ইনায়েত। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের স্ত্রী সারদাদেবীর নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর নাম রাখেন আমিনা সারদা বেগম।

নূর-এর ছোটবেলা কেটেছে মস্কোতে। পরবর্তীকালে ইনায়েত খান তাঁর পরিবার নিয়ে প্যারিসে চলে আসেন। প্যারিসে যে বাড়িটিতে তিনি সপরিবারে পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে শুরু

করেন, সেটির নাম ছিল 'ফজল মনজিল' বা 'আশীর্বাদের আবাস'। নূর-এর জীবনে এই বাড়িটির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তাঁর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বাড়িটির নামকরণ সার্থক ছিল। জীবনের সবচেয়ে আনন্দদায়ক মুহূর্তগুলো এই বাড়িতেই কাটিয়েছিলেন ইনায়েত খানের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ভাইবোনদের সঙ্গে ফজল মনজিলের সিঁড়িতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটু নিচে ছড়িয়ে থাকা প্যারী শহরের দৃশ্য উপভোগ করতেন নূর।

আট বছর বয়সে সুরেনের 'কলেজ মর্দান দা ফি'-এ ভর্তি হন নূর। স্কুলে ফরাসি ভাষায় পড়াশুনা করানো হত। নূর ফরাসি ভাষায় তেমন সড়গড় ছিলেন না। বাড়িতে তাঁরা ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতেন। প্রথমদিকে স্কুলে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়েন নূর। কারণ স্কুলের ফরাসি ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি ছিলেন বিদেশিনী। হিদায়েত (নূরের ভাই) মনে করেন, ফরাসি স্কুলের পরিবেশ এবং অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রচুর সাহস দরকার ছিল। এই সাহস নূর-এর ছিল। চুল ও কৃষ্ণবর্ণ চেহারার জন্য নূরকে সহজেই আলাদা করা যেত। কিছুদিনের মধ্যে তিনি প্রাথমিক নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে ওঠেন। ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব হয়। শান্ত এবং মিষ্টি স্বভাবের জন্য খুব তাড়াতাড়ি সকলের প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠেন এবং বন্ধুবৎসল আচরণের জন্য 'Good Comradeship' পুরস্কারও পান নূর। কে জানত, এই ছোট্ট সুন্দর শান্ত, মিষ্টি স্বভাবের মেয়েটি একদিন স্ফুলিঙ্গ হয়ে জ্বলে উঠবে।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের মাটিতে মৃত্যু হয় ইনায়েত খানের। বাবার মৃত্যুর পর থেকেই ভীষণ কঠিন হয়ে ওঠে নূরের জীবন। স্বামীর মৃত্যুর ফলে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েন মা আমিনা। তিনি ফজল মনজিলের উপর তলার একটি অন্ধকার ঘরে নিজেকে কার্যত বন্দি করে ফেলেন। সংসার সামলানোর মতো শারীরিক সক্ষমতা তাঁর ছিল না। একদিকে প্রয়াত বাবা এবং অপরদিকে প্রায় অকেজো মা, এমন পরিস্থিতিতে গোটা পরিবারের দায়িত্ব নেন নূর। সংসারের বিভিন্ন কাজের তদারকি থেকে শুরু করে অসুস্থ ভাইবোনদের সেবা করা গোটা পরিবারই একা হাতে সামলাতেন তিনি। ফজল মনজিলে আসা অতিথিরা নূরের কর্তব্যবোধ দেখে অবাক হতেন। এত কিছুর মধ্যে নূর-এর কবিপ্রতিভা থেমে থাকেনি। এগার বছর বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে কবিত্বের উন্মেষ দেখা গিয়েছিল। মায়ের হতাশা, দুঃখ কাটানোর জন্য তাঁর সম্বল ছিল কবিতা। তাঁর এহেন কীর্তি দেখেই বোঝা যায়, অল্প বয়স থেকেই স্বার্থত্যাগ, পরের জন্য নিজের আনন্দটুকু বিসর্জন দেওয়ার মতো ব্যাপারগুলো তাঁর মধ্যে শিকড় গেড়ে গিয়েছিল। পনেরো বছর বয়সে অর্থাৎ, ১৯২৯ সালে, ইনায়েত খানের মৃত্যুর দুবছর পর আমিনা বেগমের জন্য কবিতা লেখেন নূর। কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া হল :

আমাদের প্রিয় আম্মা

রয়েছ তুমি হৃদয়মাঝে

বহুমূল্য রত্নসম

গৃহীত হোক কৃতজ্ঞতার ফুল

রত্নখানি থাকুক মোদের হৃদয়মাঝেই

দেখো, ফুলগুলি আম্মা

আল্লার ঐশ্বরিক ছোঁয়া রয়েছে তাদের পাপড়িতে

পাপড়ির এই সৌন্দর্য

রইল তোমার আর আব্বার চরণেই।

আসুক প্রলয়, আসুক তুফান

জীবনের পরশমণি হিসেবে থাকুক অক্ষত

ভালবাসার যে বীজ উপ্ত হয়েছে মোদের হৃদয়ে

পবিত্র নির্জনে রয়েছে যা

শিখেছি, হৃদয়ে কন্টকাকীর্ণ রাস্তা

শেষ হয় অনাবিল সুখে।

ফ্রান্সে শিশু সাহিত্যিক হিসাবে নূরের খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৩৯ সালের ১৩ আগস্ট তাঁর লেখা 'স কন অত লেক ফোয়া দাঁ লা বোয়া' (বনে মাঝে মধ্যেই যে শব্দ আমরা শুনতে পাই) ল্য ফিগারোর সংবাদপত্রে ছোটদের পাতায় প্রকাশিত হয়। লেখার পাশাপাশি গল্পগুলির ছবিও নূর আঁকেন। বলা বাহুল্য তাঁর লেখা এবং আঁকা দুটোই অসাধারণ প্রশংসা পায়।

সংবাদ পত্র-পত্রিকার বাইরে বেতারে সম্প্রচারিত হত নূরের লেখা গল্প। সাহিত্যিক হিসেবে দ্রুত উঠে আসছিলেন নূর। কিন্তু বাধ সাধল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর ছায়া। ইউরোপে সামগ্রিক রাজনৈতিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটছিল। ১৯৩৯ সালের ১৫ মার্চ চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করে জার্মানি। তার একমাসের মধ্যেই ঘোষিত হয় জার্মানি এবং ইতালির চুক্তি।

গোটা পশ্চিম ইউরোপের উপর শ্যেন দৃষ্টি পড়ে। ইউরোপ মহাদেশ জুড়ে জার্মান আক্রমণের ভয় চেপে বসে। আতঙ্কের পরিবেশেই মুক্তি পায় নূরের প্রথম বই 'টোয়েন্টি জাতকা টেলস্'।

নূরের প্রকাশিত প্রথম বইটি সাফল্যের মুখ দেখার পর তিনি বাচ্চাদের একটি সংবাদপত্র প্রকাশনার উদ্যোগ নেন। নতুন সংবাদপত্রের নাম দেওয়া হয় 'বেল এজ' (সুন্দর সময়)। বেল এজ-কে বাস্তবিক রূপ দিতে জোর কদমে এগোচ্ছিলেন নূর।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুর্নিবার গতিকে হারাতে পারেননি তিনি। এই যুদ্ধ তাঁর জীবনের গতিপথকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দেয়। নাৎসী মতাদর্শের প্রতি একটি সহজাত ঘৃণা ছিল নূরের। ইউরোপে হিটলার এবং নাৎসী বাহিনীর নেতৃত্বে ইহুদী হত্যা, ইহুদী বিরোধী কার্যকলাপ চরমে পৌঁছেছিল। এহেন নারকীয় কার্যকলাপের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন নূর। আধ্যাত্মিক মুসলমান পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন নূর। জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেন নূর। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এবং তাঁর ছোট বোন ক্লেয়ার, 'ইউনয়ি' দ্য ফেমস দ্য ফ্রঁস (ফরাসি রেড ক্রস) -এ নাম লেখান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নূর এবং তাঁর বোন দু'জনেই একটি হাসপাতালে কাজ করছিলেন। কিন্তু হামলার ভয়ে গোটা হাসপাতালই খালি করে দেওয়া হয় এবং বাকিদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় দু'বোনের।

একটি মুসলিম সুফি পরিবারের মেয়ে নূর স্বাভাবিকভাবেই অহিংসনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু নাৎসীদের নারকীয় অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে নূর স্থির থাকতে পারেননি। নূর এবং তাঁর ভাই বিলায়েৎ স্থির করেন, ইংল্যান্ডে গিয়ে যুদ্ধের কাজে নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। বিলায়েতের ইচ্ছে ছিল সৈন্য বিভাগে যোগ দেওয়ার, অন্যদিকে নূর - এর চোখ ছিল নার্সিং বা সৈন্য বিভাগের উপর। প্রাথমিক চিকিৎসায় তিনি প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন যা এক্ষেত্রে কাজ দিত। তাই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাইবোন দু'জনেই কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলেন। পরিবারের সকলকেই নিজেদের কঠিন সিদ্ধান্তের কথা জানান বিলায়েত এবং নূর। চার ভাইবোনদের মধ্যে একমাত্র হিদায়েতই বিবাহিত ছিলেন। তিনি ফ্রান্স ছাড়তে রাজি হননি। ইংল্যান্ড যেতে রাজি হননি নুরের কাকারাও। অবশেষে নূর বিলায়েত, ক্লেয়ার এবং মা আমিনা ফ্রান্স ছাড়ার প্রস্তুতি নেন।

১৯৪০ সালের ৫ জুন প্যারি ছাড়েন নূর এবং তাঁর পরিবার। রাস্তায় উপচে পড়ছিল ভিড়। দূরন্ত গতিতে এগিয়ে আসা জার্মান বাহিনীর নাগালের বাইরে কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে চাইছিলেন অসংখ্য মানুষ। ভিড়ের সঙ্গে আতঙ্ক এবং গুজব যোগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল এক পরিস্থিতির। জার্মান বাহিনী প্যারীতে পা রাখার আগেই, ফরাসি রাজধানীর জনসংখ্যার মোট দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ শহর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিলেন। ফরাসি রাজধানীর বাইরে ফ্রান্সের নির্মল, শান্ত গ্রামাঞ্চলেও যুদ্ধের প্রভাব পড়েছিল। গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতার পাশাপাশি মানুষ এবং যন্ত্রের ভিড় এক চরম বৈষম্যের জন্ম

দেয়। ফ্রান্স ছাড়ার বিস্তারিত বিবরণ নূরের কয়েকটি নথিপত্র এবং তাঁর লেখা কয়েকটি চিঠিতে পাওয়া যায়। ফরাসি জেনারেল শার্ল দ্য গল নাৎসী অধিকৃত ফ্রান্স ছেড়ে ব্রিটেনে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। তাঁর আগমনের খবরে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন নূর। ফ্রান্সের পতনের পরও কিছু সংখ্যক ফরাসি সেনা জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শার্ল দ্য গলের আগমনে তাঁরাও অনুপ্রাণিত ব্রিটেন থেকে শার্ল দ্য গলকে বেতারে সম্প্রচার করার অধিকার দেওয়া হয়। জেনারেল ফরাসি প্রতিরোধ আন্দোলনকে আরও জোরদার করার ডাক দেন। দ্য গলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'ফ্রি ফ্রেঞ্চ' সংগঠন। লন্ডনে ডিউক স্ট্রিটে 'ফ্রি ফ্রেঞ্চ' এর একটি কার্যালয় খোলা হয়।

একটি দণ্ডের উপর দুটি ক্রস, 'ফ্রি ফ্রেঞ্চ' সংগঠনের প্রতীকটি গোড়া থেকেই আপন করে নেন নূর। তাঁর পোশাক আশাকে স্থান পেয়েছিল এই প্রতীক। যুদ্ধের বাতাবরণে জেনারেল দ্য গলের নেতৃত্বে ফ্রি ফ্রেঞ্চ সংগঠনের তোড়জোড় তাঁর কাছে অত্যন্ত সুখকর বিষয় ছিল। লন্ডনেই বোমা বর্ষণের আতঙ্ক প্রকৃত অর্থে টের পান নূর। ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে একটানা বোমা বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় লন্ডন। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে মহিলাদের সামরিক বিভাগের কাজে যোগদান করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছিল। এই প্রচার প্রভাবিত করে নূরকে। নাৎসী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর যে সংকল্প তিনি এবং বিলায়েৎ নিয়েছিলেন, তা পূরণ করার সময় এসে গিয়েছিল। ১৯৪০ সালের হেমন্তকালে অবশেষে নিজের রেডক্রস সার্টিফিকেটটি হাতে পান নূর। বার্কশায়ারের স্লোউ - এর কাছে অবস্থিত 'ফুলার চেজ মেটারনিটি হোম ফর অফিসার্স ওয়াইডস' নামের একটি সংস্থায় তিনি যোগ দেন। মেটার্নিটি হোমে নার্সিং- এর বদলে ঘর - গৃহস্থালির কাজ বেশি করতে হত নূরকে। কিন্তু মনে মনে আরও গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজের দায়িত্ব নিতে উৎসুক ছিলেন তিনি। তাঁর ভাই বিলায়েৎ ততদিনে রয়্যাল এয়ারফোর্সে কাজে যোগদান করেছেন। ভাইকে অনুসরণ করে নূর উইমেনস্ অক্সিলিয়ারি ফোর্সে (WAAF) চাকরির আবেদন করেন। রয়্যাল এয়ারফোর্সকে সাহায্য করার জন্য ১৯৩৯ সালে গঠিত হয় WAAF। এখানে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি কাজে মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। যেমন- টেলিফোনিস্ট, টেলিপ্রিন্টার অপারেটার, প্লটার, রেডিয়ো অপারেটার ইত্যাদি। উদ্দেশ্য ছিল এই সকল ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ জোরদার করা। যাতে পুরুষরা বেশি করে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারে। WAAF- এর সর্বময় প্রধান খোদ ব্রিটেনের রানি। রানির উপস্থিতি এই সংস্থায় যোগদান করতে ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবীদের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করে। ১৯৪০ সালের ১৯ নভেম্বর ৪২৪৫৯৮ এসি ডব্লিউ ২ (এয়ারক্র্যাফটস উওম্যান সেকেন্ড ক্লাস) হিসেবে ডব্লিউ এ এ এফ-এ যোগ দেন নূর। নোরা ইনায়েৎ খান নামে নথিভুক্ত করা হয় তাঁকে। গণ্ডগোল এড়াতে নিজেকে চার্চ অফ ইংল্যান্ডের অনুগামী বলে পরিচয় দেন তিনি। নিজের নামের সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্যই 'নোরা' নামটি বেছে নেন নূর। আসলে বিলায়েতের

অভিজ্ঞতার থেকেই শিক্ষা নিয়ে ছিলেন নূর। এয়ারফোর্সে যোগ দেওয়ার সময় বিলায়েতের পুরো নাম কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছিল না নথিভুক্তির দায়িত্বে থাকা কেরানিটির। শেষ পর্যন্ত বিলায়েতকে 'ভিক' নামটি প্রদান করেন তিনি। বিলায়েতের ধর্মমত জানার কোন চেষ্টাই না করে, তাঁকে সোজাসুজি চার্চ অফ ইংল্যান্ডের অনুগামী এক খ্রিস্টান হিসাবে নথিভুক্ত করেন সেই কেরানিটি, নাম এবং ধর্মে কিছুটা পরিবর্তন এনে নূর গণ্ডগোলের আশঙ্কা অঙ্কুরেই নির্মূল করে দেন। WAAF- এ প্রশিক্ষণ শিবিরে নূর - এর সহকর্মী ছিলেন হিল্ডা প্রেস্টন এবং আইরিন সল্টার। এদের দুজনের স্মৃতিতেই অক্ষুণ্ণ রয়েছে নূর - এর নাম। প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই নিজের দক্ষতার পরিচয় দেন নূর। কাজকর্মে উন্নতির জন্য 'এ গ্রেড' পান তিনি। আইরিন সল্টারের স্মৃতিতে নূর একজন ভদ্র, মার্জিত, লাজুক স্বভাবের মেয়ে হিসেবেই থেকে গিয়েছেন। নূরের আরও এক সহকর্মী ছিলেন ডরথি রেম্যান। তাঁর স্মৃতিচারণায় ফুটে ওঠে সদা হাস্যময়ী নূর, ডরথি জানিয়েছেন, কঠোর পরিশ্রম, ক্লান্তিকর কাজেও নূরের মুখের হাসি বা সহকর্মীদের উদ্দেশে মিষ্ট সম্ভাষণ কখনও লোপ পেত না। নূরকে একজন দক্ষ অপারেটার হিসেবে অভিহিত করেছেন তাঁর আর এক সহকর্মী নোরা ওয়েনম্যান।

ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এক নতুন দিকে মোড় নেয়। কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই জার্মানির ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকেই সমর্থন করছিলেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের যোগদানের পক্ষেও তাঁরা মত দিয়েছিলেন। বিনিময়ে তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে এই আশ্বাস চেয়েছিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হলে তারা ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করবে। কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে একমত ছিলেন না। তিনি ব্রিটিশদের পরাস্ত করার জন্য ফ্যাসিস্ত জার্মানির সাহায্য প্রত্যাশা করেছিলেন। নূর সুভাষচন্দ্র বসুকে সমর্থন করতে পারেননি, তবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অটুট। ভারতের স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে নূর জওহরলাল নেহরু এবং মহাত্মা গান্ধীর মতকেই সমর্থন করেছিলেন। নূর কোনও আদর্শকেই অন্ধভাবে সমর্থন করতেন না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর একটা নিজস্ব মতামত ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতীয়দের শাসনভার ভারতীয়দের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। তবে একসময় তাঁর মনে হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতীয় স্বাধীনতার দাবি তোলার উপযুক্ত সময় নয়। বরং ভারতীয়রা যদি যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সহায়তা করে এবং যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দিতে পারে, তাহলে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার তাদের স্বাধীনতা প্রদান করতে বাধ্য হবে। ভারতীয় জনমানসে তৈরি হবে নতুন আত্মবিশ্বাস। ভারতীয় বংশোদ্ভূত হওয়ার সুবাদে নূর মনে করতেন যুদ্ধে তাঁর সামান্য ভূমিকাও ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করবে। নূরের ছোটভাই হিদায়েতের স্থির ধারণা ছিল, জীবিত থাকলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করতেন নূর। সাম্রাজ্যবাদ এবং বলপূর্বক অধিগ্রহণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন নূর। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল

তাঁর। আমিনার থেকে দূরে থাকলেও, মায়ের একাকীত্ব যাতে কখনও পীড়াদায়ক না হয়ে ওঠে, সেদিকে নজর ছিল নূরের। ট্রেনিং এর ব্যস্ততার মধ্যে আমিনার জন্মদিনে নিজের হাতে তৈরি কার্ড এবং উপহার দিতে ভোলেননি ।

মায়ের উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন—

ওঠো তাকাও, আজ তোমার জন্মদিন

আজ হবে তোমার সকল ইচ্ছে পূরণ

কাজ হাতে আছে অনেক, কিন্তু আজ শুধুই খেলার দিন সব দুঃখ ভুলে গিয়ে গোটা দিনটাই আজ রঙিন।

ইংল্যান্ডে ভাসছে আমাদের হর্ষ ধ্বনি

অভিনন্দন বডলেইয়ান লেনের,

অভিনন্দন স্কটল্যান্ডের ওয়্যারলেসের অভিনন্দন রয়্যাল এয়ারফোর্সের প্লেনের

(বাংলায় অনুবাদকরণ)

নূর সবসময় চেষ্টা করতেন মায়ের জীবনকে আর একটু সুখকর করে তুলতে। সেই উদ্দেশ্যেই নিজের বেতনের সিংহভাগ আমিনার হাতে তুলে দিতেন তিনি। মা তথা পরিবারের প্রতি নূরের দায়িত্ববোধ তাঁর সহকর্মিদের মুগ্ধ করেছিল। WAAF এর মেয়েরা ছুটি পেলেই নিজের প্রেমিকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তেন বা কোন ক্লাবে যেতেন বিনোদনের জন্য, এক্ষেত্রে নূর ছিলেন ব্যতিক্রমী, ছুটি পেলেই তিনি আমিনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসতেন।

WAAF- এর প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হলে নূর তাঁর নিয়োগের সাক্ষাৎকারের জন্য তৈরি হন। এস.ও.ই (স্পেশাল অপারেশনস এগজিকিউটিভ)-তে নূরের সাক্ষাৎকারটি ছিল একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। সাক্ষাৎকারে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জানতে চান প্রশ্নকর্তারা। এক্ষেত্রে তিনি ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির তোয়াক্কা না করে নিজের মতামত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। নির্ভয়ে বলেন, নিজেদের রক্ষার দায়িত্ব নিজেদের হাতেই তুলে নিক ভারতীয়রা। জাপানে আক্রমণ ঠেকাতে ভারতীয়দের নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তোলার কথাও বলেন নূর। তিনি ভালো করেই জানতেন তাঁর ধ্যানধারণার সঙ্গে প্রশ্নকর্তারা সহমত পোষণ করবেন না। একসময় তাঁর বাবা তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষ টিপু

সুলতানের ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দিতেন। মৃত্যুর প্রায় দেড়শো বছর পর সেদিন নূরের মধ্যে জেগে উঠেছিলেন টিপু সুলতান। ইন্টারভিউয়ের সময় তাঁর নির্ভীক উত্তর প্রমাণ করে যে তিনি টিপু সুলতানের যোগ্য উত্তরসূরি, নূর জানতেন, তাঁর স্পষ্ট উত্তর দেওয়াটা প্রশ্নকর্তাদের পছন্দ হবে না। কিন্তু ভেবেচিন্তে উত্তর দেওয়াতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না আবেগের বশে ভাবনার কথা পরিষ্কার করে বলেছিলেন। এবং চাকরির আশা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বয়ং নূরও জানতেন না, তাঁর জীবন এক সম্পূর্ণ আলাদা খাতে বইতে চলেছে। মসকোডে তাঁর সাবলীলতা সামরিক গোয়েন্দাবিভাগের উচ্চপদ কর্তাদের নজর কেড়েছিল। ফলস্বরূপ এস.ও.ই দপ্তরে তিনি একজন কর্মী হিসাবে যোগদান করেন। ফরাসি এবং ইংরাজি দুই ভাষাতেই নূর অনর্গল কথা বলতে পারতেন। এস.ও.ই কর্তৃপক্ষের কাছে এই ক্ষমতা ছিল চিত্তাকর্ষক। তাঁর কয়েকটি ক্ষমতা ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছিল এস.ও.ই -র কর্মসূচি। এমন এক কর্মসূচি যার সঙ্গে স্বপ্নাতুর শিশুসাহিত্যিক নূরের চিন্তাশীল মননের কোন সংগতি ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে একমত ছিলেন না নূর। কিন্তু খোদ চার্চিলের তৈরি একটি বিভাগে তাঁর চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছিল। ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে এক গুপ্তচর হিসেবে নিজের ভূমিকা পালন করতে চলেছিলেন নূর ইনায়েত খান।

নূর ছিলেন অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী সুফি পরিবারের মেয়ে। কিন্তু তিনি যুদ্ধের কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি তাঁর মায়ের সঙ্গে অনেক লড়াই করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয় প্রয়োজনে এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিও অস্ত্র তুলে নিতে পারেন। কিন্তু তাঁর এই ধরনের আচরণের পিছনে কারণটা হবে নিতান্তই প্রয়োজন, কোন হিংসাত্মক প্রবৃত্তি নয়।

মুসলমান পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও ভগবৎ গীতার শ্লোকের মধ্যে আত্মার শান্তি খুঁজে পেতেন তিনি। গীতার কর্মযোগের বাণীকে তিনি তাঁর অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর বাবার দেখানো পথেই হাঁটেন তিনি। নূরের মনে হয়, নিষ্ক্রিয়তার চেয়ে সম্মুখ সমরে নামাই শ্রেয়। হিটলারের স্বৈরচারিতা এবং তাঁর আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে নিজের প্রকৃত অবস্থান বুঝে নিতে তাঁর একটুও দ্বিধা হয়নি। এ ব্যাপারে তাঁর পারিবারিক ধর্মমত তাঁর কাছে গৌণ বিষয় ছিল। তিনি স্বেচ্ছায় হিংসার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি জার্মানির বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছিলেন। তবে জার্মানির সৈনিকদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ছিল না, তাঁর ক্রোধ ছিল অত্যাচারী গোপন পুলিশ জার্মানির গেস্টাপোদের প্রতি। পরবর্তীকালে এই গেস্টাপোদের বিরুদ্ধেই গুপ্তচর বৃত্তি করতে হয় তাঁকে। প্রায় তিনমাস গেস্টাপোদের সমস্ত ফন্দি ফিকিরকে ব্যর্থ করে, মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে জার্মানদের পিছনে ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। হয়তো জীবিত অবস্থায় তিনি ফ্রান্স থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু বাধ সাধে ভাগ্য এবং 'রেনিং' নামে

এক মহিলা। এক জার্মান অফিসারের বর্ণনায়, রেনিং ছিলেন 'বেশ মোটা চেহারার' এক ফরাসি মহিলা। বয়স আন্দাজ ত্রিশ। নূরের নাড়ি নূরের নক্ষত্র গেস্টাপোর হাতে তুলে দেন রেনি, এমনকি তাঁর গোপন আস্তানার খবরও। অর্থের বিনিময়ে তিনি এই কাজ করেন। গেস্টাপোর হাতে নূরের যে বর্ণনা ছিল, রেনির বর্ণনার সাথে তা হুবহু মিলে যায়। সেই সঙ্গে নূরের ঠিকানাটিও এবার পেয়ে যান তারা ।

অতঃপর শুরু হয় জেরা। নূরের রাগ তখনও মেটেনি। আর্নস্ট ফোকের সামনে তিনি অনমনীয় থাকেন। সমস্ত প্রশ্নের উত্তরেই তিনি বলেন, পরিণাম যাই হোক না কেন, তিনি কোন কথা বলবেন না। গেস্টাপোর কবল থেকে তিনি একবার পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেন, কিন্তু ফোকের চেষ্টায় তা ব্যর্থ হয়। এরপর ফোক আর ঝুঁকি নেননি। তিনি নূরকে সোজা হাজতে চালান করে দেন। জেলের ছোট খুপরিতে বসে ভেঙে পড়েন নূর। হতাশা, ঘৃণা, আক্রোশ সবরকম অনুভূতি তাঁকে একজোটে ঘিরে ধরে। তাঁর মনে হচ্ছিল গেস্টাপোর হাতে ধরা দেওয়ার থেকে তাঁর মরে যাওয়াই ভালো ছিল। নিজেকে এক ভীরু জীব বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। বন্ধ ঘরে তাঁর প্রায় উন্মাদের মত অবস্থা হয়। গেস্টাপোর প্রবল প্রতাপে থরহরি কম্পমান প্রায় প্রত্যেকেই। কিন্তু নূর ছিলেন তাদের সকলের চেয়ে আলাদা। বন্দি অবস্থাতেও তিনি গেস্টাপোর কাছে পরিষ্কার পোশাকআশাক, প্রসাধন সামগ্রী এবং কাগজের দাবি পেশ করেন। গেস্টাপোর উপর মহল বুঝতে পারে। এই বন্দিটি সাধারণ তালিকাভুক্ত নন, দাবি না মানলেই বেঁকে বসবেন। বন্দিনী নূরের মানসিকতা তুবড়ে দিতে পারেনি জার্মানরা। রবার্ট ডাউলেন, গিলবার্ট নরম্যানের মতো পোড়খাওয়া এজেন্টরা যেখানে অত্যাচার সইতে পারেনি সেখানে নিগ্রহ অত্যাচারে মুখের নূর ছিলেন অবিচল। মনে মনে চারিত্রিক দৃঢ়তার তারিফ করেন জার্মানরাও নূরকে ফর্ৎসহেইম জেল থেকে দাখোউ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে এবং সেখানেই তাঁকে হত্যা করা হয়। ১৯৪৯ সালে ৫ এপ্রিল মরণোত্তর জর্জক্রস সম্মানে ভূষিত হন নূর। এটি ব্রিটেনের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান। নূরের সম্মানে ফ্রান্সের সুরেনের একটি পর্ণাবৃত খোলা রাস্তা 'নূর মাদলিন' হিসেবে নামাঙ্কিত হয়েছে। দাখোউ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের সামনে একটি ফলকে নূর এবং তাঁর তিন সহকর্মীর নাম খোদাই করা আছে।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে নূরের মরণোত্তর জর্জ ক্রশে ভূষিত হওয়ার দশদিন পরেই ইহজগৎ ত্যাগ করেন আমিনা বেগম। দিদির অনুপস্থিতিতে সংসারের হাল ধরেছিলেন বিলায়েত। তিনি আমিনাকে প্যারিতে ফিরিয়ে আনেন। সন্তান শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি আমিনা, তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছিল। তিনি শুধু নূরের মরণোত্তর সম্মানে ভূষিত হওয়ার খবরটির জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন এবং সেটি পাওয়া মাত্র পৃথিবীর প্রতি তাঁর মায়া কেটে

যায়। প্রায় সাত বছর পর ফজল মনজিলে ফিরে আসে খান পরিবার। ফজল মনজিলে ফিরিয়ে দেওয়া হয় নূরের প্রিয় হাফিজ। ইনায়েত খানের স্মারক চিহ্নের মধ্যে থাকে সেটি।

অবর্ণনীয় ছিল নূরের আত্মমর্যাদাবোধ এবং সাহসিকতা। নাৎসীদের অত্যাচারে সামান্য মুখ খোলেননি তিনি, প্রকাশ করেননি কোন গোপন তথ্য বা তাঁর সহকর্মীদের নাম। তিনি শ্বেতাঙ্গ ছিলেন না বলে তাঁর উপর অত্যাচারের মাত্রা তীব্র ছিল। সেপ্টেম্বর মাসের এক শীতল সকালে নাৎসীদের এক ক্যাম্পের কাছে হাঁটু গেড়ে বসতে বলা হয় তাঁকে– শেষ হয়ে যায় তাঁর জীবন। নিজের আত্মবলিদানের ফলাফল দেখে যেতে পারেননি নূর। তবে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি প্রার্থনা করেছেন পরবর্তী প্রজন্ম যেন এক স্বাধীন পৃথিবীকে পায়। দাখোউ - এর সেই বাগান স্বাধীন পৃথিবীর প্রতি নূরের অমর উপহারের সাক্ষ্য বহন করছে।

পুনর্মুদ্রিত

পূর্ব প্রকাশ: একসাথে পত্রিকা, বৈশাখ, ১৪২২

# Literature in the age of Al : A Debate in Hell

**Dr. Abhijit Ghosh**

**Assistant Professor**

**Dept. of English**

Someday in the not too distant future, Artificial Intelligence is going to take over the world; or to put it modestly, it shall perform most of the thinking and doing. Ironically, a multinational IT company has named its Al project as 'Bard', which means poet. Let's say if Al has the capability of creating art, what would happen to art in general and literature in particular ? Literature is for human beings and of human beings, and presumably it will continue to be, but what if it is not by human beings anymore !

Amid this impending crisis on earth, we are allowed to overhear a leisurely debate in a coffee house in hell among some like and unlike minded friends and colleagues.

Dante: Hello friends ! We have completed our journeys on earth, and now find ourselves in this infernal cafe. I guess you have heard the latest fad on earth. It's called Al. In a recent interview, a famous science fiction writer on earth has said that he already uses Al to generate plots and characters for his stories and that Al would eventually write stories or novels by itself. So what do you think of it?

Virgil: I had sung of arms and men, the heroism of mankind and the founding of civilizations, just as the blind minstrel Homer sang of the exploits of Achilles and Agamemnon and Odysseus. We had composed the grand narratives of mankind. I fail to imagine how Al would compose an epic !

Plato: I declare Virtual is the new Real. And what need do we have of epics? Poets and novelists deal in falsities. I can foresee that Republics of the future, run by technocrats, would do away with literature as it is unnecessary to society's rational and moral progress.

Aristotle: If all art is imitation, Al would probably do the work better than human beings. And if the primary function of art is didactic, Al would be able to decide what would benefit humankind the most.

Longinus: Art is the gateway to ecstasy and the "sublime" is the way to discern greatness of literature. The scientists and programmers would no

doubt create an algorithm to logically determine sublimity, and trigger the desired ecstasy for future readers.

Shakespeare: To surrender to artificial intelligence, or not to, that is the question. For in the most emphatic sense it is a question rooted in the verb "to be". It is an existential question, a question of 'be - ing' human beings. Alas ! Our tomorrows will never be the same. Our kind is destined to a dusty death!

Sophocles: Unlike Hamlet, human beings are not wavering amid the gloomy clouds of indecision, are they? They have submitted to it; and since they have already surrendered, what would be their fate? And what about Fate, Chance and the gods? If after creating AI, human beings presume to have finally become gods, then what will happen to the gods? The way that human beings are gloating over their triumph, it will surely be their Nemesis. The hubris of mankind will lead to their fall.

Nietzsche: Don't worry. God is Dead. Man has ultimately surpassed himself by creating AI.

Barthes: I had told you that authors were dead. And people thought I was speaking metaphorically. Now readers get to decide what they want. Stories will be custom made for the pleasure of readers.

Goethe: In AI I can see the same hunger for knowledge and power as Faust. But unlike Faust it doesn't have a soul. That is what I fear.

Descartes: When I declared, 'I think, therefore , I am,' I had celebrated Man. Is it perhaps, overburdened by thought that mankind has now relinquished the responsibility of thinking to machines ?

Milton: Yes, the overblown ego of Man had decided that it had usurped God and occupied the centre of the universe as the meaning giving authority. So I had to put Man in his proper place and justify the ways of God to Mankind. I wonder what AI would think of humans in the ages to come!

Austen: Our literature comprises works in which the greatest powers of the mind are displayed, in which the most thorough knowledge of human nature, the happiest delineations of its varieties, the liveliest effusions of wit and humour are conveyed to the world in the best chosen language . Would AI be capable of doing this?

Pope: Well AI actually might do a better job than human authors. For what is the art of a poet but to dress ordinary thoughts more ornamentally and uniquely and put forth ideas more beautifully and humorously. Poetry is about symmetry and order.

Wordsworth (vehemently): What of the Imagination! I grant that AI is more intelligent and would probably be more comprehensive than human beings, but would AI be self aware? Would it experience beauty or wonder at the glory of Nature?

Coleridge: What about mystery and magic and madness ! The human mind confronted by the unfathomed darkness of creation ! How can AI describe the wonder and thrill of it ?

Keats: A machine, however intelligent, shall always be guided by fact and logic. Can it ever accept and amalgamate uncertainties and mysteries? Can AI have negative capability? No it shall never. Will the algorithm reproduce the whole gamut of human emotions:love and hatred, happiness and suffering, guilt and shame, pity and mercy?

Shelley: AI would only sustain an unimaginative, unfeeling and conformist society. Nobody will ever dream of a revolution, or would be allowed to.

Eliot: We modernists were the last hope for mankind. Our obscurity was the last stand against artificiality and a mechanistic civilization. After us, the hyperreal and simulation have prevailed over the real and the true. There is no point to anything now.

Joyce: I only hope the inconsistent, paradoxical and chaotic human mind remains beyond AI.

Woolf: Yes, maybe AI would fail to comprehend the illogical, wavering and variegated streams of human consciousness. But I wonder how AI would interpret a woman's experience of life? Would it reproduce and reinstate patriarchy?

Beauvoir: No. In the age of AI women would never again be deemed secondary to men. The awful, repressive patriarchy wouldn't be breathing down our necks.

Eventually the light hearted debate heated up and it was a veritable Pandemonium. All of them spoke at once; their egos too vain to pay attention to other opinions. But then a recent entrant, leaning against the walls of the cafe and listening intently to the great debate, dared to raise his voice above the clamour.

Bloom: Ladies and Gentlemen! I bow down before thee and beg for an audience. I belong to the lesser tribe of critics and I humbly admit to the sin of having judged your great literary merit once. I had vainly aspired to uphold and prescribe the Western literary canon. I am not sure about poets, novelists and dramatists, but I know literary critics would be jobless,

as machines would judge and evaluate greatness in art and literature. But I have a question for this august company assembled here. Whose names do you think would appear in the literary canon determined by AI?

The remark caused a great consternation. An uneasy quiet descended, as all grew anxious about how the value of their works would be decided by AI. If judged inferior, would they be thrown into the everlasting tedium of heaven?

---

## Revolutionary Bijoy Krishna Modak

**Partha Chattopadhyay**

**State Aided College Teacher, Deapartment of Bengali**

In the history of India, there are countless people of great personality, who had selflessly devoted their whole lives for people of their nations and working among those who have suffered, fighting against the root of human sufferings, by giving up all their happiness and luxury of their own lives. The most respected Bijoy Krishna Modak was one among them, who was compassionate towards his countrymen, especially oppressed people, people who were from downtrodden classes. He had been one among all the oppressed human souls of our society. He was born in such an era, when the whole world, including our country, was divided into two classes—the oppressor and the oppressed, when the oppressed people were exploited by the ruling class, when people were victimised with sheer injustice and humiliation. Had the exploiters understood the immense pain that the common people felt, there would never have distinction among castes, among community, between the rich and the poor. Bijoy Krishna Modak, born in that era, understood this situation by heart and fought selflessly, a fight which can be learnt and understood from his later life.

Bijoy Krishna Modak was born on 27th June, 1906. The son of Binoy Krishna Modak, he had been very fastidious, physically strong and intelligent in his student life. He took his first education from Hooghly Vidyamandir and he had been among the first batch of that school. After completion of education from Hooghly Vidyamandir, he had passed the entrance examination from Gauria Sarva vidyayatan in 1922. He was determined not to study in any Government aided schools. At that time, the only Swadeshi

school was National Council of Education (established in 1905), under which there was education system on Engineering. Bijoy Modak was finally admitted to Engineering School, later known to be Jadavpur University of Engineering and Technology. In 1927, he secured himself in the first position and graduated from the institution as the best student of the college. His father wanted him to study abroad, but when the Government informed about the non-availability of the passport, he uttered, 'In my heart I am utterly happy to imagine that my mind is not ready – even at that time, was not ready to accept the traditional lifestyle so common that time.' Later, he devoted himself only for the betterment of his own country by giving up all the opportunities that could shape his own life. The only motto of his life till his death was the people of his own country. He has been an inspiration to all the people not only as an intelligent student but also as a shining example in his professional life. He was a dedicated freedom fighter in India's Freedom Struggle, as well as an organiser of different mass movements. Jyoti Basu, the then Hon'ble Chief Minister of West Bengal, in his work, "Atiter Smriti Theke"(From The Memory of The Past), mentioned about Bijoy Krishna Modak's connection with his maternal aunt. He had once seen Bijoy Krishna Modak to leave a pistol to his maternal aunt. Bijoy Krishna Modak, in his "Memoir of Freedom Struggle" which was published under "Progotishil Pakhhik Patrika" (published from Khanakul),once said, 'Justice N.K. Basu, Pabitra, the nephew of Comrade Jyoti Basu was also involved in the movement.' There was a revolver with him. And his aim was unparalleled not only regarding weapons but also in every aspect. He had also learnt boxing from Ashok Chattopadhyay. On 17th March 1990, in an interview taken by the respected Firoz Hussain an ailing Bijoy Krishna Modak had reminisced regarding his selfless struggle in his life. One can also find various aspects of his life, such as his contribution in the development of less known villages like Balagarh and Arambagh, from his Memoirs of Past The Indian Freedom Struggle and also from his seminal prose work, "Hooghly Jail Ke Niropekkhota Mukto Korar Dayitwo Kar?"He took an active part in the 1921 non-cooperation movement led by Gandhiji. He had even collected Rs. 51 for Kisan Fund from the entire region of Balagarh. He leaned towards the communist movement when he found the Congress being split. In 1931, he decided to form a Revolutionist Party, and even formed "Indian Proletarian Revolutionary Party" which was later merged with the Communist Party. We can get an example of how much he had dreamt of liberating India. Bijoy Krishna Modak was heard to having lunch one afternoon and when he was about to take leave of a lady (of whom he was the guest) , she said that she had arranged meal for him. He immediately accepted her request and relished a belly full of rice and gourd and said, 'I have to roam through forests as means of escape from the

police. I have had a seven-day meal today because I may not have food for those seven days ahead.' Such was his dedication.

Regarding the nature of freedom struggle against the British, Bijoy Krishna Modak once said, 'Each year, a large number of revolutionists are drawing back from the revolutionary activities just to fulfil their personal achievements. There is no concrete plan for revolutionary efforts.' He has been repeatedly imprisoned for his involvement in Indian freedom struggle. In prison he mentally prepared himself to work among the peasants of the villages. His dream was to build the Congress movement. He believed that the strength of Congress lies in the remote areas and villages. He tried to give his efforts a concrete shape, the first experience being at Arambagh. In 1921, the Dwarakeshwar Dam broke and flooded multiple areas including Mahisgoat, Khanakul and many more. Comrade Bijoy Modak has shared his experience at Arambagh, his journey to Khadimandal for organising movements against the British. In 1932-33, he took an active part in Union Tax Abolition at Arambagh. In 1930 he and Atulya Ghosh were arrested from Bodo Jangal Kutir. After getting released from jail, Bijoy Modak went to Arambagh from which he got arrested again. In the year 1931, an ailing Modak went to Khadimandal and returned from Arambagh suffer being inflicted with malaria. He once said humorously, 'This is what is known as the Malaria of Arambagh. It did not fail to lead its hands over an otherwise healthy person like me!' The people of Khadimandal got enough opportunity to get their jobs. But Bijoy Krishna Modak was deeply concerned about the people of Khadimandal and the fact that if Khadimondal was the only way to fulfil their demands. His words prove his awareness towards the condition of common people. He once said, 'The revolution of Arambagh from late 1929 to early 1931 inspired me to shape my later communist life.'

Besides Arambagh, Bijoy Krishna Modak also showed his love for different other areas near Balagarh by travelling Jirat, Khamargachi, Somra, Guptipara and many more. He once said, 'During the flood of 1939 I came to Shrikanta village and could clearly observe the situation of the people. I could see the real India. at least 95% of people were landless. Most of the people were of Scheduled caste, peasants, and almost all of them were illiterate.' He took part in several revolutionary activities along with those people of backward classes of Balagarh Block. Bijoy Krishna Modak once said, 'Only the people of the upper class get the opportunity to be in the bright lamp of civilization'. But he had an immense sympathy towards the oppressed, weary and dejected. In order to abolish this grim farcical side of this civilisation, Bijoy Krishna Modak took an initiative in organising a movement for the people of Boga Shrikanto, an area two or three miles

away from Khamargachi, the area which was badly affected by the 1939 flood. The movement was organised to provide flood relief to those people as well as to oppose the Union Tax system imposed upon the flood-affected people. The movement spread in all parts of Balagarh. He later took part in the Tebhaga Revolution and then formed a Fishermen's Organisation which gradually moved towards Rukeshpur and other villages as well. Later on, Bijoy Krishna Modak also united the fishermen who were the refugees from East Bengal (presently Bangladesh) and organised a revolution for those people who are destitute. He also revolted against the Zamindari system at Balagarh Police Station. In the interview with Firoz Hussain, he stated that during the revolutions he had been immensely assisted by a brave peasant named Zainuddin Saheb. Zainuddin had been strongly acquainted with Kazi Nazrul Islam and Shoumendranath Tagore, the nephew of Poet Rabindranath Tagore. He always carried a stick over which there was an inscription 'Let The Zamindari System and Capitalism be Destroyed.' Even after 1932, Bijoy Krishna Modak and Zainuddin Saheb had always been cooperative towards each other in all other movements. They had organised a movement for the refugees, and stood by the people affected by the flood caused by Behula river. Thus Bijoy Krishna Modak tirelessly strived to shine the light of civilization in the then backward regions of Balagarh by forming or being associated with numerous revolutionary movements. Undoubtedly, it is because of his indomitable will power for which people once oppressed and crestfallen were able to raise their voice full of hope and positivity. In 1957, he was elected to the Legislative Assembly. In this election, he was elected as a representative and was sent from Balagarh to the Legislative Assembly. His love for the people of Balagarh is evident from his statements: 'Even though I belong to the city, the people of Balagarh are very dear to me and many of them think that I am from Balagarh. And I am very happy about that.'

Another aspect of the character of Bijoy Krishna Modak can also be found. In spite of being a Marxist, he had a pretty good acquaintance with people of other political groups. In this regard, the leading freedom fighter Ganesh Chandra Ghosh stated, 'I myself am a believer of Gandhi philosophy. Our respected Sri Bijoy Krishna Modak believes in Marxist ideology. Even though we differed in political views we were both in agreement and strived for the betterment of the people who belonged to downtrodden society, people who were illiterate, and the whole nation.' Bijoy Krishna Modak , despite being different from the Congressmen, was still with the Congress. Being asked, he stated, 'I definitely have nothing in common with these people. But why am I with them? Because we did have a similar viewpoint– working among the poor and the oppressed. Somewhere I

knew that there is an indomitable revolutionary spirit of India inherent among those people.'

Bijoy Krishna Modak devoted his life not only towards social awareness but also towards education system. He once said, 'After the long 45 years of Indian Independence, elementary education should be mandatory within ten years as per the Indian Constitution. For the last forty-eight years, implementing education system had beenmere words uttered by Capitalists.' He had further said, 'A society becomes illuminated and democratic by the people who have enlightened themselves with proper education.' Bijoy Krishna Modak had given his dream a concrete shape by establishing an elementary school at Shrikanta, the most underdeveloped village of that period. It is heard that this dedicated freedom fighter, while setting up the primary school at the village Shrikanta, carried soil for foundation. In an interview with the respected Firoz Hussein, Bijoy Krishna Modak stated that he had built the school where they had collected bundles of paddy and from whom they had harvested paddy.Today, children of that area once backward in literacy are getting opportunity to pursue higher education. Perhaps his most significant contribution in the field of education is the establishment of Balagarh Bijoy Krishna Mahavidyalaya. Veteran freedom fighter Shri Ganesh Chandra Mukhopadhyay, in his seminal work, "Deshpremik Bijoybabu" said, 'The most respected Shri Bijoy Krishna Modak had become penniless after donating all his property for the sake of the college'. Bijoy Krishna Modak showed his eagerness regarding the college after the proposal of establishing it being raised by Shri Abinash Pramanik, Firoz Hussein and Nitai Ghosh. He decided to arrange a meeting with eminent persons irrespective of different political outlooks. As a consequence, a degree college establishment committee was formed on 12th December 1982 with 84 members in an all-party meeting. Being asked by the committee members to pay money for the land, Bijoy Krishna Modak stated that he had nothing left to pay and all he had was a small part of his ancestral house. Later on, he had given initial money for the land. Then, on 26th January 1983, there held a public meeting in which the foundation of Balagarh Bijoy Krishna Mahavidyalaya was laid by Bijoy Krishna Modak. Within years, a hut was made of bamboo fence and it was granted recognition as higher educational institution, thereby, generating hope of pursuing higher education among many people of that region. As per the proposal made by the veteran freedom fighter Ganesh Chandra Mukherjee, the institution would be named after the person who would pay the highest amount of money for the college. When the name of Bijoy Krishna Modak was suggested, he firmly disapproved and stated that he would not lend helping hand for college if it happened. Despite his refusal, the college was

named Bijoy Krishna Mahavidyalaya because of his unwavering enthusiasm for implementing higher education by dedicating his whole life as well as his entire saving. During the late fifties or the early sixties, there was an attempt to establish another college near Jirat bus stand in the name of Late Shyamaprasad Mukhopadhdhyay with a signboard being hung at the roadside. But later it could not be fulfilled. Balagarh Bijoy Krishna Mahavidyalaya, which started its journey in shaping the dream of the learners of that area, is now under gradual progress.

Thus, what we learn from the life and activities of the venerable Bijoy Krishna Modak is that the real strength lies not in one's finance, but in one's indomitable will-power. Poets and Literary artists over the ages have been showcasing several aspects of society through their creativity. As eminent writer Sharatchandra Chattopadhyay once said, 'Those who only offer helping hand, receive nothing'. Similarly Tagore, in most of his poems, portrays different aspects of the world and the contribution of the people of the world in shaping the society. But the real pioneers of a progressive society are people like Bijoy Krishna Modak, who had dedicated his entire life for the betterment of society by giving up luxuries and happiness of his own life. We, the people of Balagarh Block are fortunate enough to get acquainted with him. He made us learn the path of history with proper analysis. He made us aware of the persisting hunger and poverty resulting in relevance of socialism. The only way to pay tribute to him is to carry out his dream. This eminent personality left us for the heavenly abode on 9th May 1994. He was the soul of Balagarh Bijoy Krishna Mahavidyalaya. The nation, especially the people of Balagarh block lost an honest freedom fighter, a scholar, and above all, a leader. I feel that there should be a full-length biography dedicated to Bijoy Krishna Modak to be published. By publishing a book, gathering all the snippets of his life and activities, we can motivate ourselves by his life, his contribution in education and social reform as well as his ideology. Historically the book will be equally relevant, as his entire life journey is associated with India under British Empire, their conduct and governance towards Indians and many more. The book will be historically important because of the perfect portrayal of Indian freedom movement.

- Translated by

Amrita Chakraborty

State Aided College Teacher, Department of English

## "সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি"

**রাহুল ঘোষ**

**প্রাক্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ**

সালটা তখন ২০০৭। সদ্য এম.এ পাশ করে সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি তখন তুঙ্গে। লক্ষ্য কিছুটা বৃহৎ, সরকারি আধিকারিক হওয়ার। কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর যে লড়াই তা মোটেই সহজ নয়। সাথে ছিল বেকারত্বের ভীতি। তাই বেকারত্বের নাগপাশে আবদ্ধ হওয়ার আগেই সৌভাগ্যবশত ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে অতিথি শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হবার সুযোগ পাওয়া গেল। বিষয় : ইতিহাস।

ক্লাস পিছু ৬০ টাকা পাওয়া যাবে এই শর্তে আমি সেখানে নিযুক্ত হলাম ইতিহাসের শিক্ষক হিসাবে। বর্তমানের নিরিখে টাকাটার অঙ্ক অল্প মনে হলেও আমার কাছে সেটা ছিল আমার প্রথম অর্থ উপার্জনের মাধ্যম। তাই তার গুরুত্বও ছিল অসীম। প্রথম দিন কলেজে প্রবেশ করে আমার প্রথম ভালোলাগার জিনিসটা ছিল একসঙ্গে সমস্ত শিক্ষকের একত্রে একটি ঘরে অবস্থান। কোনও ভেদাভেদ দেখতে পেলাম না। মাসে ৬০০০০ টাকা উপার্জনকারী অধ্যাপক ক্লাস পিছু ৬০ টাকা উপার্জনকারী অতিথি শিক্ষকের সঙ্গে এক আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে হাসি-তামাশা করছেন। সদ্য ২৪ পেরোনো সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছেলেটিকে এই আন্তরিকতা অত্যন্ত প্রলুব্ধ করলো। আমার পূর্ব-পরিচিত এবং ইতিহাস বিভাগের সেই সময়ের বিভাগীয় প্রধান আকবর বাবু  একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন সমস্ত অধ্যাপক এবং অতিথি শিক্ষকের সঙ্গে। সকলেই ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক এবং স্নেহ পরায়ণ। ব্যতিক্রমী ছিলেন সেই সময়ের অধ্যক্ষ মহাশয়। তাকে আমি আমার অতিথি শিক্ষক থাকার সময়কালে কখনো হাসতে দেখিনি। পরে দেখেছি, কিন্তু কখন, সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য।

সময়টা যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া এবং স্মার্টফোনের থেকে অনেকটাই পূর্ববর্তী ছিল, তাই মাথা নিচু করে মোবাইলের মধ্যে ঢুকে পড়ার অভ্যাসটা তখনও মানুষের মধ্যে আসেনি। বোতাম টেপা মোবাইল ছিল যোগাযোগের মাধ্যম। সেই কারণবশত টিচার্স রুমের  প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে আমি দেখেছিলাম একে অপরের প্রতি একটা অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। টিচার্স রুমের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক। বিশেষত সেই সময়ে সমবয়সী শিক্ষকদের এত আধিক্য ছিল যে, হাসিঠাট্টা মশকরা এগুলো ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। একে অপরের সঙ্গে টিফিন ভাগ করে খাওয়া, অন্য শিক্ষকের জন্য অতিরিক্ত টিফিন বাড়ি থেকে নিয়ে আশা, এই সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলি স্কুল জীবনের স্মৃতি ফিরিয়ে দিত।

অতিথি শিক্ষকদের মধ্যে সর্বদা অন্যত্র চলে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকতোই। সকলেই অল্পবিস্তর সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমিও ব্যতিক্রমী ছিলাম না। এই প্রস্তুতিকালে আমি তৎকালীন অধ্যাপকদের যথেষ্ট সহযোগিতা এবং সাহায্য পেয়েছিলাম। এজন্য আমি তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আর ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে এখানে শিক্ষকতা করার সুবাদে বিষয়টির প্রতি দখলও খুব বেড়ে গিয়েছিল সেই সময়। তাই ইতিহাস বিষয়টিকে নিয়ে আলাদা করে কোন প্রস্তুতি নিতে হয়নি।

তারই ফলস্বরূপ ২০০৯ সালের এসএসসি পরীক্ষা পাশ করে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলাম হুগলি জেলার গোঘাটের একটি স্কুলে। বলাগড় কলেজে অতিথি অধ্যাপক হিসাবে আমার কর্মকাল সমাপ্ত হলো। কিন্তু ঈপ্সিত লক্ষ্য তখনো অর্জিত হয়নি। তাই প্রস্তুতি চলতেই থাকল। অবশেষে ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে ২০০৯ সালের ডাব্লিউবিসিএস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সরকারি আধিকারিক হিসেবে যোগদান নিশ্চিত হল। দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের একটি স্বীকৃতি মিলল। অবশেষে সরকারি স্তরে দীর্ঘ নথি যাচাইয়ের পর ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আধিকারিক হিসেবে সরকারি ক্ষেত্রে যোগদান করলাম।

কিন্তু বলাগড় কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলো না। সরকারি চাকরিতে যোগদানের ঠিক একদিন আগে জনৈক অধ্যাপকের আমন্ত্রণে বলাগড় কলেজে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সেমিনারে আমি বক্তব্য রাখতে গেছিলাম। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি কিভাবে নেওয়া দরকার সেই বিষয়ে কিছু কথা সেইদিন আমি বলেছিলাম। কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি ছিল, অতিথি শিক্ষক হিসাবে যিনি আমার প্রিন্সিপাল ছিলেন, তিনি সেদিন সহাস্যবদনে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। জিরাট স্টেশনে দাঁড়িয়ে যাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি কোনও উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তিনি নিজে থেকে এসে আমার সঙ্গে কথা বলছেন! এই ঘটনাটি আমাকে একটি বড় শিক্ষা দিয়ে যায়। ঘটনাটি আমাকে বলে দিয়ে যায় যে, "বৎস, মানুষ নয়, চেয়ারের গুরুত্ব অনেক বেশি। যুগের ধর্মই হল ক্ষমতাবানকে তৈলমর্দন করা, আর ক্ষমতাহীনকে পদদলিত করা"। ১৩ বছর আধিকারিক হিসেবে এই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে চলেছি প্রতিনিয়ত।

তবে আজও পুরাতন কিছু ভালোলাগার মানুষ বলাগড় কলেজে বিদ্যমান। তাদের সাথে যোগাযোগ হলে আজও মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সেই সময়ে অর্থের প্রাচুর্য ছিল না, কিন্তু ছিল অনাবিল আনন্দ। পুরাতন মানুষদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের সাথে কাটানো প্রায় তিন বছর সময়ের স্মৃতি-রোমন্থনে কেটে যায় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত। সত্যই স্মৃতি সতত সুখের।

## আসন : একটি প্রাথমিক ধারণা

**মীনা ঘোষ**

**(শিক্ষাকর্মী)**

'যোগ' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'যুজ' ধাতু থেকে এর অর্থ হল কোন দুটি জিনিসকে যুক্ত করা বা একত্র করা। প্রাচীন মুনি ঋষিদের মতে "জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনই হলো যোগ"।

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"

যোগের জনক মহর্ষি পতঞ্জলি যোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, যোগ হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে চিন্তা, ভাবনা, বিচার, বুদ্ধি, অনুভব, কল্পনা, মানসিক কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব।

২২০০ বছর আগে মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ সাধনার পথে এবং সাধারণ জীবনযাত্রার পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বিজ্ঞানসম্মত আটটি স্তরের কথা উল্লেখ করেন। সেগুলি হল –

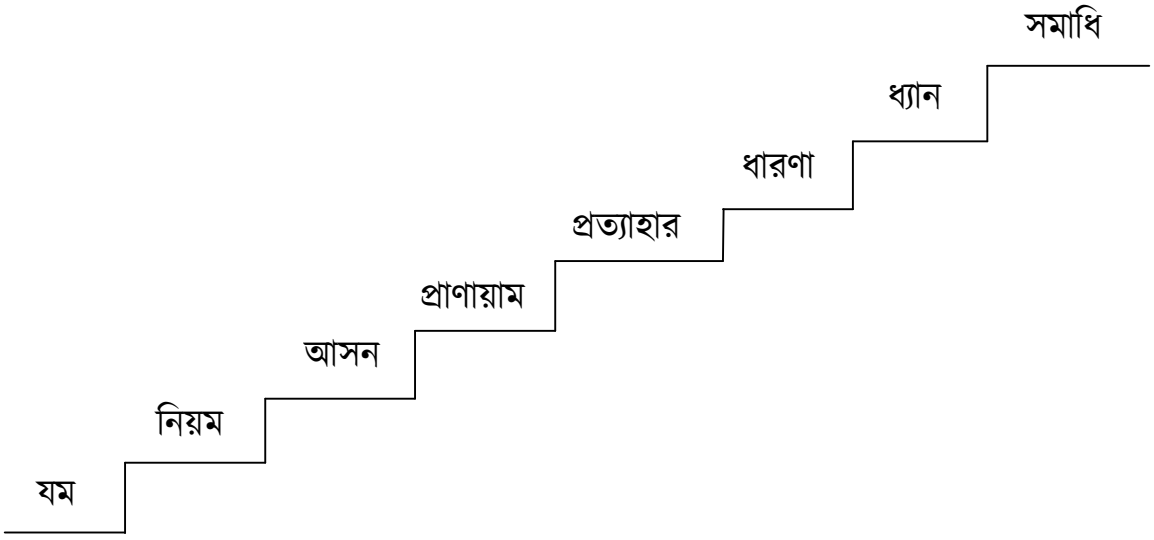


এই আটটি ধাপকে 'অষ্টাঙ্গ যোগ' বলা হয়।

সাধারণ জীবনযাত্রায় এগিয়ে চলার জন্য প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ পাওয়া যায় এই 'অষ্টাঙ্গ' যোগ থেকে। তার মধ্যে আসনটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে।

আসন সম্বন্ধে বলতে গেলে সংস্কৃত 'আস্' ধাতু থেকে আসন শব্দটি এসেছে।

একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় মনোযোগ সহকারে কিছু সময়ের জন্য বসাকে বলা হয় আসন।

"স্থিরসুখমাসনম্"

অর্থ স্থির সুখকর অবস্থানই আসন। 'যোগ'-এর সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিকাল নিয়ে মতভেদ আছে। তবে আনুমানিক ৪০০০ বছর পূর্বে প্রাচীন ঋকবেদে যোগের কথা উল্লেখ আছে। শাস্ত্রকারগণের মতে দেবাদিদেব মহাদেব এই 'যোগ' এর সৃষ্টিকর্তা। পুরাকালে শিব ৮৪ লক্ষ আসনের কথা বলেছেন। আসনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন হল সিদ্ধাসন। আসনকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হল—

১. ধ্যানাসন - পদ্মাসন, বজ্রাসন, গোমুখাসন, সিদ্ধাসন ইত্যাদি।

২. স্বাস্থ্যাসন - শলভাসন, ত্রিকোণাসন, চক্রাসন, ভুজঙ্গাসন ইত্যাদি।

৩. বিশ্রামাসন - শবাসন, মকরাসন, ষটিআসন।

ছোট বড়, পুরুষ মহিলা, সাধু-অসাধু, যেকোনো ধর্মের মানুষ যেকোনো বয়সে আসন করতে পারেন।

**আসনের উপকারিতা :-**

১. শারীরিক ও মানসিক উন্নতির মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

২. আসন অভ্যাস করলে দেহ শান্ত থাকে, কোন ক্লান্তি থাকে না, মন সতেজ থাকে।

৩. মেরুদণ্ড নমনীয় হয় ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৪. স্নায়ুতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৫. মানসিক ধৈর্য ও একাগ্রতা বাড়ে। মানসিক উন্নতি ঘটে।

৬. মস্তিষ্কের পরিচালন ক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তি বাড়ে।

৭. আসন নিয়মিত অভ্যাসে সুস্থ, সবল, নীরোগ ও কর্মঠ দেহ তৈরি হয়।

৮. দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি যেমন - লিভার, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, থাইরয়েড, পিটুইটারি গ্রন্থির কর্মক্ষমতা বাড়ে।

৯. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। নানা প্রকার রোগ মুক্তিতে সাহায্য করে আসন।

১০. হজম শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে, বজ্রাসন।

১১. কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে আসন – যোগমুদ্রা, হলাসন, ভুজঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন, পবনমুক্তাসন ইত্যাদি।

১২. অতিরিক্ত মেদ কমায় – চক্রাসন, হলাসন, পদ্মাসন, ধনুরাসন, অর্ধচন্দ্রাসন ইত্যাদি।

১৩. উচ্চরক্তচাপ কমায় বজ্রাসন।

১৪. নিম্ন রক্তচাপ কমায় পবনমুক্তাসন, সর্বাঙ্গাসন, শশকাসন, পদহস্তাসন ইত্যাদি।

১৫. হাঁপানির হাত থেকে রক্ষা করে চন্দ্রাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, অর্ধচন্দ্রাসন ইত্যাদি।

১৬. কোমর ব্যথা কমায় ভুজঙ্গাসন, শলভাসন, চক্রাসন, ধনুরাসন ইত্যাদি।

১৭. সায়াটিকার ব্যথা দূর করে বজ্রাসন, ধনুরাসন, একপদশলভাসন, পার্শ্বচন্দ্রাসন, অর্ধচন্দ্রাসন ইত্যাদি।

১৮. সর্বাঙ্গাসন, হলাসন, শশকাসন, শীর্ষাসন, সিংহাসন, ত্রিকোণাসন ইত্যাদি আসন থাইরয়েডের গোলযোগে উপকার আনে।

১৯. যাদের ডায়াবেটিস আছে তার জানুশিরাসন, পদহস্তাসন, ত্রিকোণাসন, অর্ধকূর্মাসন ইত্যাদি আসনে উপকার পাবে।

২০. কোলেস্টেরল বৃদ্ধি পেলে পদ্মাসন, জানুশিরাসন, উষ্ট্রাসন, মৎস্যাসন ইত্যাদি অভ্যাসে উপকারী।

২১. টেনশন দূর করে পদ্মাসন, উষ্ট্রাসন, মৎস্যাসন, বৃক্ষাসন ইত্যাদি।

২২. স্মৃতিশক্তি বাড়ায় শশকাসন, উষ্ট্রাসন, শীর্ষাসন, বৃক্ষাসন, ত্রিকোণাসন, পদহস্তাসন ইত্যাদি।

২৩. মানসিক অবসাদ দূর করে বজ্রাসন, পদ্মাসন, সিংহাসন, চক্রাসন ইত্যাদি।

২৪. সার্ভাইক্যাল স্পন্ডিলাইটিস-এ উপকার আনে ভুজঙ্গাসন। শলভাসন, নাভিআসন, উষ্ট্রাসন, বক্রাসন ইত্যাদি।

২৫. অর্শ রোগীর জন্য সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, শলভাসন, ভদ্রাসন, উষ্ট্রাসন ইত্যাদি।

২৬. আসন অভ্যাসে সর্দি কাশি, ঠান্ডা লাগা দূর করে যেমন- সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, শশকাসন।

২৭. সিদ্ধাসন অভ্যাসে দেহের ৭২ হাজার নাড়ীর দোষ ত্রুটি দূর হয়।

২৮. দৈহিক ক্লান্তি দূর করে পদ্মাসন, শবাসন, মকরাসন, সুখাসন।

২৯. অনিয়মিত ঋতুস্রাব নিয়ন্ত্রণ করে আসন। নাভিআসন, ধনুরাসন, ভদ্রাসন, শলভাসন।

৩০. পদ্মাসন শবাসন, গোমুখাসন, ত্রিকোণাসন, ষষ্টিআসন করলে মাথা ধরা বা মাথা ব্যথা কমে যায়।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনযাত্রা বজায় রাখতে এবং নীরোগ ও কর্মক্ষম দেহ গড়ে তুলতে আমাদের আসন হল বিশেষ কার্যকরী একটি পদ্ধতি।

---

## অ্যারিস্টটল : আজও সমান প্রাসঙ্গিক

**সায়ন্তিকা দাস**

**রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেস্টার**

এথেন্সের দুশো মাইল উত্তরে প্রায় গ্রিসের সীমারেখায় অবস্থিত একটি নগর রাষ্ট্র ম্যাসিডন। ইতিহাসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, রাজা পঞ্চম ফিলিপের শাসনভার গ্রহণের আগে পর্যন্ত গ্রিসবাসীর কাছে ম্যাসিডনের পরিচয় ছিল অবাধ্য, অশান্ত, আধা-বর্বর পার্বত্য উপজাতি বেষ্টিত অঞ্চল হিসাবে। ম্যাসিডনের এই আধা-বর্বর উপজাতিদের এক সূত্রে বেঁধে একটি শক্তিশালী, সুশৃংখল ও সমৃদ্ধ নগর রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন রাজা ফিলিপ। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র আলেকজান্ডার তার শক্তি ও শাসনকৌশলে ম্যাসিডনের মতো আধা- গ্রীক রাষ্ট্রকে পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বলভাবে চিহ্নিত করেছেন তা নয়, ম্যাসিডনের নেতৃত্বেই বিচ্ছিন্ন গ্রীক রাষ্ট্রকে একত্র করেছেন এবং প্রাচ্যে-প্রতীচ্যেছড়িয়ে দিয়েছেন গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয়। এই ম্যাসিডনের একটি নগরী স্ট্যাগিরায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন বিখ্যাত মনীষী ও প্রবাদ পুরুষ অ্যারিস্টটল। ঐতিহাসিকরা অ্যারিস্টটলের শৈশব ও যৌবনকাল সম্পর্কে যেসব তথ্য দিয়েছেন তার ভিত্তিতে এটুকু বলা যায়, জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন গ্রিক ও আইওনিও বংশোদ্ভূত। এই সভ্রান্ত পরিবারেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। তার পিতা ছিলেন ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ এর চিকিৎসক। এর ফলে রাজসভা ও রাজ পরিবারের সান্নিধ্যের মধ্যেই কেটেছিল অ্যারিস্টটলের শৈশবকাল। আর ১৭ বছর বয়সে তার পিতা তাঁকে এথেন্স নগরীতে নিয়ে আসেন এবং সেখানে মহান দার্শনিক প্লেটোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররূপে যোগ

দেন। এখানে তিনি দীর্ঘ কুড়ি বছর অধ্যয়ন করেন। এখানে অধ্যয়নকালেই তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে ধরেন। এই সময় থেকেই অ্যারিস্টটলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিন্তাদর্শন গড়ে উঠতে থাকে। তাঁর চিন্তাদর্শনের মৌলিকতা ও সৃষ্টিশীলতা এতই সুগভীর ছিল যে তিনি রাষ্ট্রচিন্তার জনক হিসাবে স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। মানবিক জ্ঞানের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অবাধ পদচারণা। ৩৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩৪৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এই তিন বছর রাজা ফিলিপের নির্ভীক পুত্র আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক হিসাবে অধ্যাপনার কাজ করেন। এরপর দীর্ঘ ১৩ বছর পর তিনি আবার এথেন্স নগরীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এখানে তিনি নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'লিসেয়াম' প্রতিষ্ঠা করেন। তার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞানের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যের সংবাদে আকৃষ্ট হয়ে দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য ছাত্র তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করতে আসে। মানবিক জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি বিষয়েই ছিল তার অগাধ পাণ্ডিত্য। শুধু তাই নয়, তর্ক বিজ্ঞান, তুলনামূলক জ্যোতির্বিদ্যার মতো অভিনব শাস্ত্রের উদ্ভাবন তিনিই করেছিলেন। তাঁর জীবনকালে এবং তার পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তাই হয়ে উঠেছিল সারস্বত সাধনা ও বৌদ্ধিক সংস্কৃতির পীঠস্থান স্বরূপ। এখানে অধ্যাপনা করার সময়ই তিনি তার চিরস্থায়ী গ্রন্থগুলি রচনা করেন।

শৈশবের কয়েকটি বছর বাদ দিয়ে অ্যারিস্টটলের প্রায় ৬২ বছরের জীবনে ঘটনার অভাব ছিল না। প্লেটোর একাডেমির ছাত্র হিসাবে, সম্রাট আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক ও গবেষক হিসাবে, যেসব অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন, সেই সব অভিজ্ঞতাই হয়েছে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মূলধন। এই অভিজ্ঞতার মূলধনকে হাতিয়ার করে অ্যারিস্টটল কিছু না হলেও প্রায় ১০০ টির মত গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে ছিল তর্ক শাস্ত্র সম্পর্কিত কিছু রচনা (Categiries, Topies, Prior, Propositions প্রভৃতি) কিছু বিজ্ঞান নিয়ে রচনা (Physics, Growth and Decay, Materiology, Natural History প্রভৃতি) এবং কিছু দার্শনিক রচনা (Ethics, Politics, Metaphysics, Poetics প্রভৃতি)। Will Durant এই বিশাল কর্ম প্রয়াস এর মধ্যে গ্রিসের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সন্ধান পেয়েছেন। এমন কোন বিষয় সে সময় ছিল না যা অ্যারিস্টটলের চিন্তায় উপেক্ষিত হয়েছে। তর্কবিদ্যা, বিজ্ঞান, ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক চিন্তার অভিজ্ঞতা অ্যারিস্টটলের রাজনীতি চিন্তায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে সন্দেহ নেই। তার রাজনীতির চিন্তার বিশেষত্বগুলি লক্ষ্য করলে এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য জয় ও বিশাল কর্মকাণ্ডের তুলনায় অ্যারিস্টটলের শিক্ষা ও দার্শনিক প্রয়াস নিতান্ত কম ছিল না। রাজনীতি ও দর্শনশাস্ত্রের ছাত্রের কাছে অ্যারিস্টটলের এই দার্শনিক অভিযান এখনো বেশ মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ।

রাষ্ট্র দর্শনের যে দুটি ধারণা এখনো সমান প্রাসঙ্গিক তা হল রাষ্ট্র এবং সরকার সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মূল্যায়ন। রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে প্রচার করা ছিল অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্র দর্শনের মূল লক্ষ্য। রাষ্ট্রের ধারণাটিকে 'ঐক্য ও সমন্বয়ের' ধারণা হিসেবে উপস্থিত করা ছিল তাঁর লক্ষ্য।বাস্তবে অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থটি শুরু হয়েছে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত তত্ত্ব দিয়ে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে রাষ্ট্রের উৎস সম্পর্কে না জানতে পারলে এই আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। রাষ্ট্র একটি আকার (Form), যা মানুষের সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের বিকাশে সুপ্ত বিষয় হিসেবে ছিল। সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র গঠনের সুপ্ত বিষয়টি ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের আকারে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্র তত্ত্ব, এর উৎস খোঁজার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়েছে। অ্যারিস্টটলের মতে রাষ্ট্রের শিকড় নিহিত রয়েছে দুই ধরনের মানবিক সম্পর্কের মধ্যে – এক, স্ত্রী এবং পুরুষের পারস্পরিক জৈবিক সম্পর্ক, দুই, প্রভু এবং দাসের সম্পর্ক। এই দুই ধরনের সম্পর্ককে ভিত্তি করে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়তা মেটাতো। এরপর অনেকগুলি পরিবার একত্রিত হয়ে একটি গ্রাম গঠন করে যার মাধ্যমে মানুষ তাঁর আরো বেশি প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারে। তারপর অনেকগুলি গ্রাম মিলিত হয়ে তৈরি হয় রাষ্ট্র। রাষ্ট্র মানুষের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠন যা মানুষের সাধারণ চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি হয় কিন্তু এটি টিকে থাকে সুখী ও সুন্দর জীবন উপলব্ধি করার মাধ্যমে হিসাবে।

উপরোক্ত যুক্তিগুলি থেকে অ্যারিস্টটল কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। প্রথমতঃ রাষ্ট্র হল একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান। কারণ, রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে কতগুলি স্বাভাবিক মানবিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এবং বর্তমান রাষ্ট্রের পর্যায়ে এসেছে পরিবার এবং গ্রামের মতো স্বাভাবিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে। এটি আরো বেশি স্বাভাবিক এই কারণেই যে, মানুষের সম্পর্কের প্রকৃতির মধ্যে যে সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল তা পরিপূর্ণ প্রকৃতির রূপ পায় রাষ্ট্রের মধ্যে এসে।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ প্রকৃতিগতভাবে একটি রাজনৈতিক জীব। অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতিগত পরিণতি হল এই যে, সে রাষ্ট্রের মধ্যেই বসবাস করবে। অ্যারিস্টটলের বিখ্যাত উক্তি হল... "রাষ্ট্রের বাইরে মানুষ হয় পশু নয় দেবতা"। কারণ প্রকৃতি মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েছে এবং কথা বলার শক্তি দিয়েছে। এর মাধ্যমে সে বুঝতে পারে কোনটি সঠিক ও কোনটি বেঠিক, কোনটি কাম্য আর কোনটি কাম্য নয়। মানুষের এই বুদ্ধিবৃত্তিই তাকে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে আলাদা করেছে। সেই বুদ্ধিবৃত্তি পরিশীলিত হতে পারে একমাত্র রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাস করে বা রাজনৈতিক জীবনের মাধ্যমে।

তৃতীয়তঃ অ্যারিস্টটল মনে করেন, সময়ের দিক থেকে বিবেচনা করলে রাষ্ট্র ব্যাক্তি বা পরিবারের পরবর্তী সংগঠন, কিন্তু দার্শনিক বিচারের রাষ্ট্রের স্থান ব্যক্তি বা পরিবারের আগে।

অ্যারিস্টটল যুক্তি দিয়েছেন, সমগ্র যখন অংশের পূর্ববর্তী, রাষ্ট্র তেমনি ব্যক্তি বা পরিবারের পূর্ববর্তী। দেহ ছাড়া হাত বা শরীরের অন্যান্য অংশের কল্পনা যেমন করা যায় না, রাষ্ট্র ছাড়া তেমনি পরিবার বা মানুষের কল্পনা করা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উপাদান বিশ্লেষণ করার পর বাস্তবে যে শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র সক্রিয় থাকে সেই শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনায় অ্যারিস্টটল অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর মতে সাধারণভাবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদের এবং বিশেষত তাঁর সর্বোচ্চ পদের যে বিন্যাস তাকেই সরকার বা শাসন ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা যায়। তিনি আরো মনে করেন যে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ তথা ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে শাসকের হাতে, সে কারণে শাসনব্যবস্থার চরিত্র নির্ধারিত হয় শাসক শ্রেণীর দ্বারা। রাষ্ট্রের এই শাসক হতে পারে একজন ব্যক্তি, কয়েকজন ব্যক্তি অথবা সম্মিলিতভাবে বহু ব্যক্তি। আবার এই শাসকের শাসন পরিচালিত হতে পারে শাসকের নিজ স্বার্থে অথবা বৃহত্তর জনস্বার্থে। এইভাবে একদিকে শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যের সংখ্যা এবং অন্যদিকে শাসনকর্মের লক্ষ্য - এই দুটিকে বিচারের মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে অ্যারিস্টটল দুটি শ্রেণীতে শাসন ব্যবস্থাকে ভাগ করেছেন- প্রকৃত এবং বিকৃত। তাঁর বিচারের শাসন যখন একজন ব্যক্তির হাতে এবং জনস্বার্থ রক্ষাই যখন এই শাসনের উদ্দেশ্য তখন এই শাসন ব্যবস্থা রাজতন্ত্র। আবার এই শাসকের লক্ষ্য যখন শাসকের সংকীর্ণ স্বার্থক পূরণ করে তখন সংশ্লিষ্ট শাসনব্যবস্থায় এটি একটি বিকৃত রূপ এবং এর নাম স্বৈরতন্ত্র। আবার কয়েকজন ব্যক্তি যখন শাসকের ভূমিকায় থাকেন এবং শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন জনস্বার্থে তখন এই শাসন ব্যবস্থার নাম অভিজাতন্ত্র। আবার যখন এটি শাসকের সংকীর্ণ সার্থক পূরণ করে তখন এটিকে চিহ্নিত করা যায় অভিজাতন্ত্রের বিকৃত রূপ হিসাবে, যার নাম মুখ্যতন্ত্র। অন্যদিকে জনসাধারণের শাসন যখন সাধারণ স্বার্থের লক্ষ্যে পরিচালিত তখন এটি অ্যারিস্টটলের মতে নিয়মতন্ত্র (Polity)। পক্ষান্তরে এই গণশাসনের লক্ষ্য কেবল শাসকের স্বার্থ পূরণ তখন এটি নিয়মতন্ত্রের বিকৃত রূপ যাকে অ্যারিস্টটল চিহ্নিত করে গণতন্ত্র রূপে। অ্যারিস্টটলের মতে সরকারের এই তিনটি প্রকৃত রূপের মধ্যে নিয়মতন্ত্র বা পলিটি হল শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা। বর্তমানে এই নিয়মতন্ত্রের বিকৃত রূপ গণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থার শিরোপা অর্জন করেছে।

অ্যারিস্টটলের পরবর্তীকালে প্রায় কোন রাষ্ট্র দার্শনিকই অ্যারিস্টটলের এই তত্ত্ব দুটিকে অস্বীকার করতে পারেননি এবং আজও পারা যায় না। এখানেই অ্যারিস্টটলের চিন্তার সার্থকতা ও প্রাসঙ্গিকতা নিহিত রয়েছে।

# ভারতের প্রথম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্ কৌটিল্য

**অন্তরা পাল**

**রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ষষ্ঠ সেমেস্টার**

মহামতি কৌটিল্য হলেন প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক সাহিত্যের মহার্ঘ্য সম্পদ অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটির স্বনামধন্য রচয়িতা। তিনি অসামান্য যুক্তিবোধ, সীমাহীন প্রজ্ঞা, অসাধারণ মেধা, অপরিমেয় তীক্ষ্ণধী, সুতীব্র বিচারশক্তি, প্রখর বাস্তবতা বোধ, প্রখর প্রশাসন চেতনা, অনন্য-সাধারণ দূরদর্শিতা এবং অসম জীবনচেতনায় সমৃদ্ধ এক তুলনাহীন মহীয়ান ব্যক্তিত্ব।

পরম প্রাজ্ঞ সুপণ্ডিত কৌটিল্য অবশ্য চাণক্য ও বিষ্ণু গুপ্ত নামেও পরিচিত ছিলেন। তক্ষশীলার এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সংসারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তদানীন্তন নন্দ বংশের রাজা মহাপদ্মনন্দ মহাশয়-এর চূড়ান্ত অপমানজনক, ঔদ্ধত্যপূর্ণ, নির্মম ও অমানবিক আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি সেই আচরণের যোগ্য জবাব দিতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন।এরপর থেকেই তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে ও তীক্ষ্ণ কৌশলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে প্রয়োজনমতো কাজে লাগিয়ে সেই রাজবংশ 'নন্দ বংশে'র' ধ্বংসলীলা সমাধা করেছিলেন। এরপর তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন এবং নিজে তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করে মৌর্য বংশের শৌর্য ও বীর্যকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছিলেন।

কৌটিল্যের সময়কাল সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক লক্ষ করা যায়। তবে মোটামুটি ভাবে অধিকাংশ প্রাজ্ঞজন মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক হলো কৌটিল্যের সময়কাল। এদিক থেকে সাধারণভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৩২১-৩০০ অব্দের সময়কালকে কৌটিল্যের জীবনকাল বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই জীবনকালেই মহামতি কৌটিল্য তাঁর অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক সাহিত্য 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটি রচনা করে ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার জগতে মহান এমিথিয়ুস-এর ভূমিকায় চিরভাস্বর হয়ে রয়েছেন।

সঠিকভাবে জানা না গেলেও অনুমান করা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর কোনও এক সময়ে 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। পণ্ডিতপ্রবর শ্যামশাস্ত্রী ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থটি আবিষ্কার করেন। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাকের কথায় "একমাত্র ভারতীয় সাহিত্যের নহে, পৃথিবীর সর্বসাহিত্যের ইতিহাসে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আবিষ্কার একটি স্মরণীয় ঘটনা"। এছাড়া ড. ইউ.

এন. ঘোষাল, এ. এস. অলটেকার এ. এল. ব্যাসাম, ডি. ডি. কোসাম্বী, বেনীপ্রসাদ, ড. ম্যাকেঞ্জি ব্রাউন, কে. ভি. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, আর. এস. কাঙ্গলে, এবং অন্যান্য লেখকদের সূত্রে জানা যায় কৌটিল্যের পাণ্ডিত্য রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা শাসনকৌশল ও কূটনীতি বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও যুক্তির কথা। অর্থশাস্ত্র একাধারে তত্ত্ব ও তথ্যের, রাজনীতি ও কূটনীতির, অর্থনীতি, দর্শন ও সমকালের সমাজ বিষয়ের এক বিশাল ভান্ডার। রাজনীতির সাথে অন্যান্য সমাজশাস্ত্রের সম্পর্ক বিচার করে রাজনীতিই যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে একথা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন কৌটিল্য। কৌটিল্যকে পশ্চিমী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ মেকিয়াভেলির সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু কৌটিল্য তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, কূটনীতিজ্ঞান সবকিছু দিয়ে প্রমাণ করেছেন তাঁর তুলনা তিনি নিজেই।

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে অত্যন্ত অভিজ্ঞতার সাথে রাজ্যশাসন, রাজ্যপালন, রাজার কর্তব্য, মন্ত্রী ও অমাত্যের দায়দায়িত্ব, প্রজা-কর্তব্য, দণ্ডদান ব্যবস্থা, কূটনীতি, আন্তঃ রাজ্য সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে সুনিবিড় ও সুসংহত আলোচনা করেছেন। মূলত রাজনীতির বিচিত্র বিষয়ে তাঁর অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের প্রাজ্ঞ ও বাস্তব বিশ্লেষণের পথ ধরেই ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার জগতটি সুবর্ণ যুগে প্রবেশ করে। অর্থশাস্ত্র গ্রন্থেই তিনি 'অর্থশাস্ত্র ধারা' নামক বিশ্লেষণী পদ্ধতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক প্রশাসনের বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও বাস্তবসম্মত আলোচনা করেছেন। বস্তুত পক্ষে অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে আলোচিত সমস্ত রাজনৈতিক-প্রশাসনিক বিষয়ই আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার জগতের দ্বার উন্মোচিত করেছে এবং এই কারণেই তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটি ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার 'স্বর্ণযান' তথা আকর গ্রন্থ স্বরূপ সন্দেহ নেই।

# Mahajani System: An Archive of Ancient Indian Accounting

**Arghya Das & Arijit Das**

**6th Semester & 2nd Semester**
**Department of Commerce**

In the bustling ancient city of Pataliputra, there was a grand archive filled with ancient manuscripts and records. Among the countless scrolls and books, there was a collection of large, red-cloth-bound books known as the 'bahis.' These 'bahis' held the secrets of the Mahajani System, an ancient Indian method of accounting that had been used by merchants for centuries.

Long ago, before the invention of money, early forms of accounting had already emerged. In Ancient Egypt, bookkeepers kept meticulous records of goods stored in royal warehouses. Similar practices were found in other early civilizations like Mesopotamia (4000-3500 B.C.), Ancient Egypt (3400 B.C.), and Ancient India (3300 B.C.).

In Ancient India, the origins of accounting could be traced back to 3300-2900 B.C. Modern humans settled in the Indian subcontinent from the Middle East, starting farming in what is now Pakistan. As they spread further due to climatic changes, their trade practices evolved. The Indus River Valley Civilization (2800-1800 B.C.) developed an early form of accounting using clay tablets and balls for trade, later replaced by precious metals.

The Mahajani System was born during the Mauryan Empire (350-185 B.C.) and continued through the Gupta Empire (320-335 C.E.). It was a sophisticated system that categorized 'bahis' into various types based on their purpose. There were Cash Bahis for cash transactions, Credit Nakal Bahis for credit records, Purchase Return Nakal Bahis, Debit Nakal Bahis, Sales Return Nakal Bahis, Petty Nakal Bahis, and other subsidiary books. Each type of 'bahi' played a crucial role in maintaining comprehensive records of every transaction.

The pages of the 'bahis' were thick and smooth, and the entries were made in crisp black ink. Unlike modern registers, the lines were created by folding the pages, a testament to the precision and care taken by the ancient accountants. The entries were written in various languages,

including Hindi, Gujarati, Marathi, Sindhi, Urdu, and Gurumukhi. To keep their records confidential, some merchants even used coded scripts.

In addition to the 'bahis,' there was a manuscript that provided deeper insights into the Mahajani System. It was the 'Arthashastra' by Vishnu Gupta, also known as Chanakya or Kautilya. Written during the Mauryan Empire, this manuscript outlined detailed aspects of maintaining books of accounts for a sovereign state. Chanakya's work showed that the principles of the Mahajani System were remarkably similar to the modern Double Entry Accounting System introduced by Luca De Barto Pacioli in 1494.

The Mahajani System had stages of primary accounting, journal entries, and ledgers. Transactions were meticulously recorded, and ledgers included Personal accounts, Stock accounts, and Profit and Loss accounts. Both the Mahajani System and the modern Double Entry System prepared trial balances to check mathematical accuracy and Profit and Loss accounts to understand the financial position of a business. This alignment showcased the advanced nature of ancient Indian commerce.

Reflecting on these findings, one could see that the Mahajani System was not just an ancient relic but a testament to the ingenuity and precision of the people who used it. It bridged the past and the present, showing that the foundations of modern accounting were laid centuries ago.

The story of the Mahajani System highlights the rich heritage of ancient Indian accounting. The ancient merchants of India had developed a scientific and comprehensive method of accounting long before the modern Double Entry System was introduced. By understanding and preserving these ancient systems, future generations could honor their heritage and build a foundation for the future.

And so, the grand archive of Pataliputra continued to stand as a beacon of knowledge. The Mahajani System, with its meticulous records and sophisticated methods, remained a testament to the brilliance of ancient Indian accounting, inspiring scholars and merchants alike for generations to come.

# নেশা

**সুমন্ত দাস**

**দ্বিতীয় সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ**

ছাত্র জীবনে বর্তমানে নেশা এক অতি মহামারীর আকার ধারণ করেছে। যে নেশা কিনা করোনার থেকেও মারাত্মক। করোনায় পাঁচ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই মৃত্যু জীবনে একবারই আসে। আর ছাত্রজীবনে আসক্তি, মোহমায়ায় যে আবদ্ধ হয়, তার ভবিষ্যৎ জীবন যে কতটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, তা কারোরই অজানা নয়। নিজের জীবন এক জীবন্ত লাশে পরিণত হয়। যে মানুষ নিজের ইচ্ছায় চলে ফিরে বেড়াত, সে অন্যের ইচ্ছায় নড়াচড়া করতে থাকে। তাই জীবনে সফলতা ও সার্থকতা অর্জন করতে চাইলে সাময়িক মোহ পরিত্যাগ করে আমাদের পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে। ভালোবাসার নেশা ছাড়াও অত্যধিক সোশ্যাল টক, গেমিং, অসামাজিক কিছু ওয়েবসিরিজ এগুলো সবই আসক্তি সৃষ্টি করে। এই সবেরই মূল কারণ মোবাইলের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। এই লাগামছাড়া মোবাইল ব্যবহার বন্ধ না করলে ছাত্রজীবন মূলস্রোত থেকে ভেসে গিয়ে পৌঁছবে অন্ধকারের তলানিতে।

# সরস্বতীর অস্থি-চর্ম

ড. প্রসেনজিৎ বসু

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

॥ ১ ॥

সৃষ্টির তখন ঊষা লগন।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা স্বয়ং জানতে চাইলেন, সৃষ্টির উপায়। একক তিনি। অ-সহায়। "সহায় হোন, ভগবতী! সহায় দিন। সৃষ্টিরূপ সাধনার জন্য দিন উপযুক্ত সাধনসঙ্গিনী।"

আদ্যাশক্তির মহাবিরাট অস্তিত্ব থেকে আবির্ভূতা হলেন বেদবাদিনী বীণাবাদিনী ব্রহ্মবাদিনী সরস্বতী। আকাশবাসিনী আকাশভাষিণী আকাশচারিণী সরস্বতী। শুক্লবসনা শুক্লভূষণা শুক্লকিরণা সরস্বতী।

ব্রহ্মাসহিত দেবগণ সাদরে সমাদরে গ্রহণ করলেন দেবীকে। জানতে চাইলেন পূজাবিধান।

দেবী নিদান দিলেন। "পুঁথি-পুস্তক, লেখনী-মস্যাধার আমার দেহ। বর্ণে-বাদ্যে আমার বসতি। শুক্ল পুষ্পে, শুক্ল মাল্যে, শুক্ল চন্দনে আমার সেবা। শুক্ল পক্ষে আমার পূজা।"

"জয় জয় জয় !" সমবেত জয়ধ্বনির মাঝে দেবী পূজা নিলেন। শুরু হল জগৎ-রচনা।

॥ ২॥

কতকাল পার হয়ে গেল। মনুষ্য প্রজাতি কোথা থেকে পৌঁছল কোথায় ! দেবদেবীরাও সেই সুবাদে গগনচুম্বী মন্দির বানিয়ে নিলেন। এক সরস্বতী বাদে।

তিনি বললেন, "আমার জাগ্রত সব পীঠস্থান তো রইলই ! রইল বিদ্যালয়। রইল মহাবিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়। গানের আখড়া। নাচের পাঠশালা। আঁকার টোল। নাটকের মহড়াঘর। নকশি-কাঁথা বোনা মেয়েদের মাটির দাওয়া। আরও কত কী ! আলাদা মন্দির আর লাগে না।"

আলাদা বিগ্রহ না থাকলেও চলে। পুঁথি-পুস্তক, দোয়াত-কলমই তো তাঁর দিব্যতনু। তাই খাগের কলমে, মাটির দোয়াতে, তালপাতার-ভূর্জপাতার-তুলোট কাগজের পুঁথিতে "জয়-জয়" ধ্বনি দিয়ে বাগদেবীর আরাধনা। বাসন্তী গাঁদা আর পলাশ-পুলকিত মৃন্ময় বেদীতে।

॥ ৩ ॥

এল যুগান্তর। এলাম আমরা। শিখলাম ব্যবহার করার পর ছুঁড়ে ফেলার কৌশল। মানুষকেই যদি ছুঁড়ে ফেলা যায়, তুচ্ছ কলমকেই বা যাবে না কেন ! কলেজের পরীক্ষার প্রহরা দিতে গিয়ে মাস্টার দেখেন, লিখতে-লিখতে কালি ফুরিয়ে গেলে, কী অনায়াস অবহেলায় মৃত কলমটিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে সরস্বতীর নবীন শাবকগণ ! ছুঁড়ে দিচ্ছে এখানে। ওখানে। সবখানে। পরিত্যক্ত একেকটি কলমকে সরস্বতীর একেকটি ভাঙা হাড় মনে হয় মাস্টারের। মাস্টার দেখেন, মজ্জাহীন শুকনো হাড়ের স্তূপ উঠছে জমে।

দেখেন, পরীক্ষা-ঘরে ঢোকার আগ-মুহূর্তে বই থেকে ফরফর করে আস্ত-আস্ত পাতা ছিঁড়ে নিচ্ছে চতুর পরীক্ষার্থী। সরস্বতীর হিমানী-ধবল নবনী-কোমল দেহ থেকে চামড়া ছিঁড়ে নেওয়ার মতো। লুকিয়ে রাখছে আস্তিনে। পকেটে। দেবতার অজ্ঞাত অন্যস্থানে।

বাঁ'হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে আণুবীক্ষণিক নকল। উত্তর লেখার শেষে সেই নকল আলগোছে ফেলে দিচ্ছে সে। চেপে রাখছে চটির তলায়। জুতো দিয়ে রগড়ে দিচ্ছে বাগদেবীর অক্ষরগঠিত ম্লানমুখ।

পরীক্ষা-শেষে পরীক্ষা-ঘরের মেঝে ভরে উঠছে বইয়ের পাতায়, নোটের খাতায়, সাজেশনের চোতায়। "বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের অবদান", "মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ" আর "রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা চলে কিনা" - তার সদুত্তর জমে থাকছে কলেজের পেচ্ছাপখানার হলদে প্যানে। জমাদারের ঝাঁটা ক্লাসরুম থেকে বারান্দা আর বারান্দা থেকে উঠোনে ঝেঁটিয়ে ফেলছে "কালিদাসের কাব্যকৃতি"।

নতমুখে মাস্টার ভাবছেন, ছাত্ররা পাশ করুক বা না করুক, মাস্টাররা ফেল করে গেছেন অনেক আগেই।

সরস্বতীর হাড়গোড়-মেদ-মজ্জা-চামড়া-মাংসময় মশানটিকে বিদ্যার আগার নয়, বিদ্যার ভাগাড় মনে হচ্ছে তাঁর।

মাস্টার দিন গুনছেন, কবে প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হবে। আবার কবে জাগবেন, "যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে"!

## The Spiritual Call

**Aliviya Chakraborty**

**English Honours, 2nd Semester**

It is said that the most powerful and sacred relationship in the world is the relationship between a brother and a sister, even in a most difficult and challenging situation they try to overcome the problems in an amazing manner. But there are many stories in this relationship which ends in a most tragic way where the harshness of death covers the life of this powerful and beautiful relationship with black clouds, so it is the story of that powerful bonding who fullfill their wishes beyond death.

"Mamma, I am going to tell you a great news! Mr. Hariprasad Chaurasia is playing tomorrow at the Vani Mahal Auditorium..." said Arin, a young boy of 15, excitedly. But his mother interrupted him pointing to his sister, Rani,who was sleeping on her bed .

Arin realised what blunder he had done. He was about to move when Rani said in her low voice, "Chau..ra..sia..the great flute maestro!" Rani, his twin sister, had been suffering from lung cancer.

Arin felt disappointed as he totally forgot about his sister's terrible health condition as his sister's days were numbered."I..must ..hear ..him ..." the suffering girl repeated. Then she began to cough and gasp for breath. Her mother went to her to give her oxygen from the cylinder. But her large eyes were fixed on her brother.

It was happened just six months ago. Rani was only 15 and the best swimmer in her school and who was most surprisingly could play flute very well. It was very uncommon to see a teenage girl from a typical middle class family to learn to play flute and excel in it. She was the greatest admirer of Chaurasia. Arin could never forget when his sweet sister began that ominous cough. She could not complete her music (flute) class. He and his sister with the help of their flute-guru came home and the next day, the doomsday, decided everything. The doctor told his father and mother that his sister's days were numbered.

Arin's mother came to him as he began weeping and whispered into his ears, "Arin, you must go, your father will take you". Rani said "you.. must..go..Ari..."But Arin told" but without you!" Arin could not complete his words as his voice chocked. Rani said, "we ..came ..in the world..at..the

s..a..m..e.. time,I will.. hear.. Chaurasia.. through.. your eyes..." After saying all these emotional words Rani again started gasping and coughing.

The very next day, Arin along with his father reached Vani Mahal Auditorium with a heavy heart and a vow in his heart as anyhow he would do something for his sister. The concert began as Pandit Hariprasad appeared on the stage along with other musicians. Spellbound, Arin listened to the enchanting Raagas - the slow plaintive notes, the fast twinkling ones. But amidst all these, he had been thinking about the dream he had last night.

The concert concluded as the audience gave the great artist a standing ovation. Suddenly, Arin told his father to wait for a while as he ran towards the Exit-Gate. To his utter surprise, he saw himself standing in front of the great "Wizard of Music" Pandit, Hariprasad Chaurasia. Suddenly with folding hands and he kneeled down in front of him and began his story - the story of his dying sister,her obsession with flute and her admiration regarding Hariji . "Panditji will you come tomorrow morning to our house?- he threw the question breathlessly to the great musician. But the organizers started to remove Arin from the great personality. But Pandit Chaurasia smiled and motioned the organizers to be quiet. "Tomorrow morning... ok child I will be there and give your address to my personal assistant". Arin was very excited as he could hardly believe to full fill the wish of his sweet sister.

Back home the scenario was completely changed as Rani's condition had deteriorated drastically. The doctor was summoned readily and after examination he just told, "May God bless her!" Arin and his parents spent a restless night. In the morning the doorbell rang at 8 a.m. sharp. As Arin opened the door, he could hardly believe his eyes. Pandit Hariprasad Chaurasia, smiling as usual, was waiting at the door step.

Panditji went along with other musicians, sat on the divan and played for the girl whose 'moments' were just numbered. As the room was flooded with the great music of Hariji's flute, tears rolled down from Rani's cheeks and life went out of her gently like the flow of Hariji's flute...

## কবিতা-সপ্তক

**কালাচাঁদ সাঁই**

**স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ**

॥১॥

তুমি বলছিলে ফিরে যেতে,

এভাবে কি ফেরা যায়,

কত অপ্রস্তুত স্মৃতি জমে,

মনের অগোছালো আয়নায়।

॥২॥

ইচ্ছে হলেই কথা না হোক

মন চাইলেই দেখা না হোক

তবুও তোমাকে মনে রাখি।

আমার একলা সকাল একলা অপরাহ্নে পাবো না পাশে

পাবো না আমার একলা সন্ধ্যায়, মন খারাপের রাতে...

দূরে থাকলেও জানবে মন

আমার একটা 'তুমি' আছে।

॥৩॥

খুঁজে খুঁজে,

পেলাম,

কে আমায় অবুঝ করে,

কে আমায় পাগল করে,

দেখলাম কে আমায় করে আবেগ তাড়িত,

বুঝলাম কী করে যে ভালোলাগা কখন

ভালোবাসা হয়।

॥৪॥

কথা হয়নি আর...

হবেও না আর হয়ত...

তবু, কেমন তোমার গন্ধ পাই

কী নেশা!

ঢেলেছ আমাতে!

ভালোবাসা কি এমনই হয় বুঝি!

বোকা বোকা লাগে নিজেকে!

তোমারও কি এমন হয়!

আমি আদৌ কিছু বুঝি!

নাকি অভ্যাসের মত

ভালবেসে চলেছি,

অবুঝ মনে!

॥৫॥

আমার চারপাশে অজানা ভুবন

অথচ 'তুমি' নামের আস্ত মানুষটা,

আমার সবটা জুড়ে কী অবলীলায় আছো...

যদি কথা হয় আজ,

চুপিসারে  রূপকথার

ক্যানভাসে..

আবারও ভিজবো খুব...

॥৬॥

বৃষ্টি সাথে ঝড়ো হাওয়া,

তোমাকে চায় মন পাশে...

অন্য কিছু চায় মন

আজকাল তোমার কথা,

বড্ড পড়ে মনে।

তুমি  ছিলে কাছে,

মনের মাঝে সে স্মৃতি,

আরেকবার ঘটে ঘটুক,

সে অঘটন পুনঃ,

চঞ্চল মনও।

॥৭॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

চির কৃতজ্ঞ থাকব তোমার কাছে...

আমার শূন্যতা জুড়ে রয়েছে তোমার অনুভূতি।

শূন্যতা পূর্ণ করি তোমার তোমার অনুভূতি দিয়ে।

একাকীত্ব কে ভরিয়ে রাখি তোমার অনুভূতিতে,

সবকিছুর মধ্যেই আজ তোমার অনুভূতি।

আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে,

তোমার প্রতি অনুভূতির জন্যে,

আমি আজীবন কৃতজ্ঞ।

## স্বপ্নহারাদের স্পীডব্রেকার

**দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য**

**স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, ইংরাজি বিভাগ**

সেদিন –

সাইকেলটা চালিয়ে,

কলেজের গেট ডিঙিয়ে একটু এগোতেই –

কী একটা পাখি মরে পড়ে আছে।

একটু থামলাম, তারপর জানাতেই,

ছুটে এলো নেচার ক্লাব,

কেউ কেউ ফেললেন দীর্ঘশ্বাস।

দুপুরে গোলটেবিল বৈঠক হল

আড্ডাতেও উঠে এলো পাখির প্রসঙ্গটা

সবাই নিজের নিজের মত ক'রে

পাখি নিয়ে গল্প তুললেন

কেউ কেউ মনে করালেন

কতদিন পাখির মাংস তিনি খাননি – খান না।

পাখির মাংসের বিপুল বাজারদর, ব্যাপক চাহিদা

পারিপার্শ্বিকতার নিরিখে আজ পাখির পরিস্থিতি

টিফিনের সাথে গিলে খেলো গুণমুগ্ধ শ্রোতা

লাশ ছেড়ে উপহাস হল শুরু,

জানো তো, এবারে আমরা অমুক পাহাড়ে যাব

ওখানেই একমাত্র অমুক পাখি দেখা যায়।

কে পাখি মেরে গেল,

অথবা নিজেই মরে গেল কি না সে,

জানা হলো না কিছুই;

জিরাট, জিম্বাবোয়ে নয়

পাখির মৃত্যুতে পাখিটাকে মাড়িয়ে যাওয়াই দস্তুর;

পচে-গলে মিশে গেল সে,

সাইকেল-বাইক, যারা পাশ কেটে চলছিল,

রোজ মাড়িয়ে যেতে লাগল একটা পালকরঙা, নোংরা "ফসিল"।

স্টুডেন্ট শূন্য একদিন

বসে বসে ভাবতে ভাবতে একটা রূপক যেন স্পষ্ট হল।

আসলে পাখি দেখতে গিয়ে,

আমরা কেউ-ই খেয়াল করিনি

একটা মানুষের "মেটাফর" নিথর হয়ে পড়ে আছে

বুকে জমানো অসংখ্য স্বপ্নের ফেরারী ছাত্রছাত্রীরা,

যাদের পাখি হয়ে উড়ে যাওয়ার কথা ছিল

পড়াশোনা আর বাইরের জীবন যাপনের কঠিন চাপে,

তাদের কোনও একটির এ এক আকস্মিক মৃত্যু।

ধীরে ধীরে সবাই ভুলে গেল, তবু

পাখিটা যেখানে মরে পড়ে ছিল,

আমাদের মনে ছিল, তাই

সেখান দিয়ে ঢালাই রাস্তা যাওয়ার সময়ে

কন্ট্রাক্টারকে বলে-কয়ে

একটা স্পীডব্রেকার করা গেল।

কলেজের প্রবেশেই, যেন থমকানো হলো নবাগতদের গতিপথ

এক রঙিন নবীন-বরণের শেষে,

বার্তা পৌঁছলো ঘরে ঘরে

স্পীডব্রেকারের আগেই থেমো আরোহী,

তোমার স্বপ্নে ধাক্কার জন্য প্রস্তুত হও।

## তুমি যে শুধুই আমার

**খেয়ালী দেবনাথ**

**স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক,**

**রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ**

অনেক দিন পর দেখা হল,

খুব করে বৃষ্টি হল।

পুরোনো আর্বজনা ধুয়ে গেল,

রাগ-অভিমানও মুছে গেল।

আমরা দুজনেই ক্লান্ত,

গাছেরাও পরিশ্রান্ত।

জল পড়ার টুপটাপ শব্দ, চারিদিক নিঃস্তব্ধ।

নিঃস্তব্ধতার মধ্যে যায় বোঝা,

কার কতটা কষ্ট।

কষ্ট ব্যক্ত করার জন্য চাই ভাষা,

যা দেবে শুধু তোমার ভালোবাসা।

খুঁজে পাই না কেন তোমায়? আমার মনের প্রতিটা কোনায়?

ফেলে আসা দিন গুলো ফিরে পেতে চাই!

না বলা কথাগুলো বলে যেতে চাই—

"তুমি যে শুধুই আমার"।।

## A Maiden's Wish

**Amrita Chakraborty**

**State Aided College Teacher, Department of English**

A charm that manifests in tunes,

Binds the words

With a soulful Harmony.

The mightiest form of expression

Leads to a boundless ecstasy,

Transcends beyond our understanding..

Mother Spring!

Oh grant me with the gift of

A Love-Wreath;

The love which will never embrace the perishable

But the Celestial Melody...

And that moment

I will simply melt into clouds.

My heart will get warmth.

At dawn

As the first rays of the Sun

Will pierce through the forest,

I will embrace the Inevitable...

In Exaltation.

[This poem has been inspired by The Snow Maiden, one of the most popular Russian winter folk tales.]

## পরাধীনতার শৃঙ্খল

**সঞ্চিতা ঘোষ, কলা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমেস্টার**

মোদের ভারত বন্দী ছিল ব্রিটিশদের হাতে,

ভারতবাসী কেঁদে মরে সকাল দুপুর রাতে।

কত মানুষ মারা গেল চাবুকের আঘাতে,

ভাবে ভারতবাসীর দল কবে মুক্ত হবে শৃঙ্খল?

মোরা হব স্বাধীন মনে করে চঞ্চল।

তাইতো সুভাষ তৈরি করল আজাদ হিন্দ ফৌজের দল।

ধীরে ধীরে মুক্ত হল পরাধীনতার শৃঙ্খল

মোদের ভারত মুক্ত হল ফুটলো মুখের হাসি

চারিদিকে বেজে ওঠে বাজনা, সানাই, বাঁশি।

## মায়ের ভালোবাসা

**স্বাতী বাউল দাস, কলা বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার**

চাই না মা আমার বেশি কিছু,

চাই শুধু তোমার ভালোবাসা।

চাই একটু আদর মা তোমার হাতের,

আর চাই মা বকুনি।

চাই শুধু তোমার স্বপ্ন যা আমি পূরণ করবো,

দিও আমায় মা সাহস।

চাই শুধু মা তোমার মুখ ভরা হাসি,

দিও আমায় সময়টুকু,

খুশির আনন্দে চোখে আসবে জল।

তোমার কষ্টের কারণ মেটাবো আমার সফলতায়,

চাই শুধু তোমার হাত আমার মাথায়।

কীভাবে বোঝাবো আমি তোমাকে কত ভালোবাসি,

পৃথিবীর সব আনন্দ উল্লাস,

তোমার পরে রাখলেও মনে হবে মূল্যহীন।

**নদী**

**সঞ্চিতা বিশ্বাস, কলা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমেস্টার**

আমি নদীর স্রোত হতে চাই,

হ্যাঁ আমি চাই নদীর স্রোত হতে

সেই নদীর যেই নদী নিত্যবহ

সেই নদী, যেই নদী কখনো কোনোদিনও থামে না

বিলীন হয়ে যায় না।

যার স্রোত আমি হবো

সেই স্রোত যা নদী বহন করবে।

বড়ো বড়ো পাথর টীলা, ইত্যাদি

চূর্ণবিচূর্ণ করে নিজের রাস্তা নিজের করে

কিন্তু,

নদীকে তো বহন করতেই হবে স্রোতকে

নদী ছাড়া যে স্রোত অসম্পূর্ণ,

যেই নদী না থেমে সাগরে বা সমুদ্রে মিলিয়ে দেবে

আমি সেই নদীর স্রোত হতে চাই,

আমি সেই নদীকেও গড়তে চাই।

যার কূল কিনারায় আষ্টেপৃষ্ঠে

ঘিরে থাকবে স্রোতের মহিমায়।

সেই নদী যার এতোটাই ভালোবাসা

এতোটাই ধারা হবে যে,

কেউ কোনো দিনো পারবেনা তাকে থমকে দিতে

পারবেনা তাকে হারাতে।

নদীর ধারা যখন বাড়ে,

নদীও তখন গড়ে।

**মা**

**অঙ্কিতা সরকার, কলা বিভাগ, প্রথম সেমিস্টার**

জীবন শুরু গর্ভে তোমার
তোমাকে প্রথম দেখা।
মমতা, নৈতিকতা, বুদ্ধিমত্তা
তোমার কাছেই শেখা।
সোনা হীরের থেকেও তুমি
খাঁটি আর দামী।
আমার কাছে গুরুত্ব তোমার
জানোই না তুমি।
তোমার আদরে কত আরাম
ভরসা যে কত।
তোমার কাছে বায়না আমার
হাজার শত শত।
তুমি আমার স্বপ্নমাখা
আঁধার পথের আলো।
তোমায় ছাড়া বলো আমি
থাকবো কি করে ভালো।
শব্দটির অর্থ অনেক
কিন্তু ছোট্ট অতি।
তার কোনো ব্যাখ্যা নেই
শুধুই অনুভূতি।
স্নেহ আর যত্ন দিয়ে
কষ্ট পেতে দাওনি।
তোমার কাছে থাকবো আমি
জীবনভর ঋণী।
পৃথিবীটা বড্ড কঠিন
সবাই ছেড়ে যায়।
শুধু তোমার হাতের স্পর্শে
সব নিরাময়।
বিপদ যখন আসে
যখন ভয় পাই।
তুমিই শুধু পাশে থাকো
তুলনা তোমার নাই।
তোমার মতন শক্তিশালী
কেউই হয় না।
নিজে কষ্ট পেয়েও আগলে রাখো
হতাশ করো না।
ঝগড়া হোক রাগ হোক
শাসনে তোমার।
তোমাকে ছাড়া চলেনা
একদিনও আমার।
জানি তোমায় কষ্ট দিই
কিছু মনে করোনা।
ইচ্ছে করে তোমায় আমি

কাঁদাতে চাই না।

না বলা মনের কথা

তুমি বুঝবে না।

সাইকোলজিস্ট না হলেও

তুমি যে মা

শুধু আমার প্রিয় মা।

**সে কিছু দিতে এসেছিল বুঝি, নাকি নিতে**

**আকাশ সরকার**

**দ্বিতীয় সেমেস্টার, কলা বিভাগ**

সে কিছু দিতে এসেছিল বুঝি

বোঝার জৌলুসে নেওয়া হলো না কিছুই

সে এসেছিল খালি বুক নিয়ে

পায়ে পা করেছে বহু ঠোকাঠুকি

সে রোদ ছিল বুঝি; সে কিছু নিতে এসেছিল মনে হয়

কিছু দেওয়া হলো না আর-কিছু ছায়া নিতে এসেছিল মনে হয়।

ছায়া ? কোন ছায়া কতটা ঘিরতে পারে
ছায়ার মতন করে

নাকি রাত্রি দেবে? নিয়ে যাবে ভীষণ
অন্ধকারে।

তাকে আমি বনানী দিতাম, দিতে পারতাম
ধানসিড়ি বুক-জলে ভেসে থাকা ছায়া,

তাকে আমি দিতে পারতাম সুরেলা অন্ধকার,
কভু বা শরৎ বেলার কৃষ্ণচূড়া।

সে কিছু দিতে এসেছিল বুঝি

নেওয়া হলো না বোঝার জৌলুসে

সে কিছু নিতে এসেছিল মনে হয়

দেওয়া হলো না শূন্য বুক দেখার অভাবে।

উড়িয়ে দিলাম এক মুঠো ছাই

ছাই বলে তা ধোরো না

এ-ছাই আমারই অস্থিপোড়া সম্বল -- তাতে দিলাম এক অভিজ্ঞতার ওড়না।

সে কিছু দিতে এসেছিল বুঝি, নাকি নিতে?

বোঝাই হলো না।

**শ্রাবণের বর্ষা**

**সুমনা ঘোষ, কলা বিভাগ, চতুর্থ সেমেস্টার**

শ্রাবণের বর্ষা যেন কাজল আঁকে নয়নে,
আচমকা গর্জন করে গঙ্গা যেন ক্রোধে।

বৃষ্টির ফোঁটা যেন নূপুর ছন্দে ভূমিতে।

বাস্তবতার ব্যাঘাত ঘটিয়ে বিদ্যুতের জাগরণ,
বৃষ্টি ভেজা কোমল ঘাস দুলছে বড়ো আনন্দে।

কাচের জানালায় জলরাশি চিত্র আঁকে, না
পড়া কবিতার ভিড়ে শালিক পাখি গান ধরে।

আষাঢ় শ্রাবণকে পিওন করে, বর্ষার কোলে
মেঘের চিঠি দোলে।

এ কেমন রচনা সৃষ্টি! কালো ঘন মেঘে এ
কেমন ধারা বৃষ্টি।

ছন্দহীন কবিতা যেন নতুন আঁকার খোঁজে,
উল্লসিত মন যেন বৃষ্টির কাছে আত্মসমর্পণ
করে।

বৃষ্টি ভেজা এ গ্রামে যখন সূর্য কিরণ আসে,
নতুন দৃশ্য চিত্র সাজে শিল্পীর তুলির নখে।

## ACADEMIC FACULTIES

1. Dr. Pratap Banerjee Principal

**DEPARTMENT OF COMMERCE**

2. Prof. Sukumar Dan Associate Professor
3. Dr. Subham Dastidar Assistant Professor
4. Prof. Arnab Ghosh State Aided College Teacher
5. Prof. Sujit Dutta State Aided College Teacher
6. Prof. Paromita Banerjee State Aided College Teacher

**Department of English**

7. Dr. Abhijit Ghosh Assistant Professor
8. Prof. Soma Biswas Assistant Professor
9. Prof. Amrita Chakraborty State Aided College Teacher
10. Prof. Dibyendu Bhattacharya State Aided College Teacher
11. Prof. Balaka Halder State Aided College Teacher

**Department of Mathematics**

12. Dr. Biswajit Paul Assistant Professor
13. Prof. Sanjukta Das State Aided College Teacher
14. Prof. Papiya Ghosh State Aided College Teacher

**Department of Physical Education**

15. Prof. Amitab Kumar Mondal State Aided College Teacher
16. Prof. Priyatosh Mondal State Aided College Teacher

**Department of Education**

17. Prof. Prayosi Adak State Aided College Teacher

**Department of Philosophy**

18. Prof. Mousumi Saha State Aided College Teacher

19. Prof. Subhendu Mondal State Aided College Teacher

**Department of Chemistry**

20. Dr. Namrata Saha State Aided College Teacher

21. Prof. Rimpa Mondal State Aided College Teacher

22. Prof. Amit kumar De State Aided College Teacher

23. Prof. Somshuddha Marik State Aided College Teacher

24. Prof. Paromita Halder State Aided College Teacher

**Department of Sanskrit**

25. Dr. Debalina Ghosh State Aided College Teacher

26. Prof. Sangita Mondal State Aided College Teacher

27. Prof. Maloy Ghosh State Aided College Teacher

28. Prof. Manidipa Modak State Aided College Teacher

**Department of Physics**

29. Prof. Uday Ghosh State Aided College Teacher

**Department of Economics**

30. Prof. Dilip Kumar Chatterjee Associate Professor

31. Prof. Kalachand Sain State Aided College Teacher

**Department of Bengali**

32. Dr. Asima Halder Assistant Professor

33. Dr. Prosenjit Bose Assistant Professor

34. Prof. Partha Chattopadhyay State Aided College Teacher

35. Dr. Susmita Das State Aided College Teacher

**Department of Geography**

36. Prof. Debapriya Ghosh State Aided College Teacher

37. Prof. Subhashis Biswas State Aided College Teacher

**Department of Political Science**

38. Prof. Dalia Hossain Associate Professor

39. Prof. Hasina khatun State Aided College Teacher

40. Prof. Kheyali Debnath State Aided College Teacher

41. Prof. Soma Sarkar State Aided College Teacher

**Department of History**

42. Prof. Akbar Hossain Associate Professor

43. Prof. Biswajit Munda Assistant Professor

44. Prof. Bani Chatterjee State Aided College Teacher

45. Prof. Piu Banerjee State Aided College Teacher

46. Prof. Saifudden SK. State Aided College Teacher

47. Prof. Mitali Ghosh State Aided College Teacher

**Non Teaching Staff**

1. Mr Ajay Bhar - Cashier

2. Mrs Anjali Pramanik - Lady Attendant

3. Mr. Narayan Mandal - Office Staff

4. Mr. Suman Chatterjee – Office Staff

5. Mr. Partha Mukhopadhyay – Office Staff

6. Mrs. Mina Ghosh (Dam) – Office Staff

7. Mr. Supratim Ghosh – Office Staff

8. Mr. Prashanta Mondal – Office Staff

9. Mr. Suman Nath – Office Staff

10. Mr. Goutam Mondal – Office Staff

| Governing Body: 2022-2023 | |
|---|---|
| President of the Governing Body | Shri Monoranjan Bapari<br>(Upto December, 2022) |
| | Sk. Mahirul Haque<br>(From January, 2023 onwards) |
| Principal & Secretary of the G.B. | Dr. Pratap Banerjee |
| State Govt. Nominee | 1. Vacant |
| | 2. Mr. Tarun Sen<br>(Up to 19.3.2023 [Expired]) |
| Nominee of West Bengal Council of Higher Education | Prof. Subrata Rana<br>Assistant Prof. of English Education<br>Khalisani Mahavidyalaya |
| University Nominee | 1. Dr. Basudeb Halder<br>Associate Prof. of Geography<br>Sarat Centenary College |
| | 2. Dr. Shrabanti Banerjee<br>Associate Professor of Chemistry<br>RRR Mahavidyalaya |
| Teachers' Representative | 1. Prof. Sukumar Dan<br>Associate Professor of Commerce |
| | 2. Md. Akbar Hossain<br>Associate Professor of History |
| | 3. Dr. Biswajit Paul<br>Assistant Professor of Mathematics |
| Non-Teaching Representative | Shri Narayan Mondal |